আদাবু তালিবুল ইলম ১৫তম দারস

তালিবে ইলমের মর্যাদা ও দায়িত্ব

এ প্রবন্ধ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে দারুল উলূম দেওবন্দের এক ছাত্র মজলিসে পঠিত হয়েছিলো। তাতে দ্বীনী মাদরাসার প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা এবং মাদরাসার শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করা হয়েছে এবং এ মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তালিবানে ইলমের কাছে বর্তমান যুগের দাবী ও চাহিদা কী? এবং দ্বীনের দাওয়াত ও খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাদের কী কী প্রস্তুতির প্রয়োজন ?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক এবং যিনি সকল জ্ঞানের আধার। দুরূদ ও সালাম তাঁর পেয়ারা রাসূলের উপর যিনি রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, যার সিনা থেকে উপৎসারিত হয়েছে উলূমে নবুয়তের ঝরনা ধারা

رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفعهوا قولي

(হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার বক্ষ প্রসন্ন করে দিন এবং আমার যাবতীয় বিষয় সহজ করে দিন এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন যেন তারা আমার কথা বোঝে।)

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম

আপনাদের সাথে আমার আজকের আলোচনার পরিচয়-সূত্র এই যে, আপনারা দ্বীনী মাদরাসার তালিবে ইলম, আর আমি দীর্ঘ দিনের এক খাদিমে ইলম। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে ইলমের যে মোবারক কাফেলা মসজিদুন্নবীর ছুফফা থেকে যাত্রা করেছে এবং যুগ যুগ ধরে যে সফর অব্যাহত রয়েছে, আমরা সবাই সেই কাফেলার সহযাত্রী ও সফরসঙ্গী। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং সময়ের নাযুকতার দাবী এই যে, কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ছাড়া আমি আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনা এবং আমার সীমিত অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলাফল আপনাদের সামনে পেশ করবো এবং আমার জীবন সফরের সবচে' মূল্যবান ও প্রিয় উপহার আপনাদের হাতে তুলে দেবো। এখানে সমবেত হয়ে এবং আলোচনার সুযোগ দিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আমার উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আমার কর্তব্য হবে নিজেকে এই আস্থা ও সম্মাননার যোগ্য প্রমাণিত করা এবং এই সামান্য সময় থেকে সর্বোচ্চ ফসল তুলে আনার চেষ্টা করা। কেননা বড় মূল্যবান ব্যস্ততা থেকে এ সময়টুকু আপনারা বের করেছেন। এটা তো এমন জীবন থেকে কেটে আনা সময়, যার প্রতিটি মুহূর্ত মাস ও বছরের হিসাবে পরিমাপযোগ্য।

মাদরাসার পরিচয় ও মর্যাদা

বন্ধুগণ! সর্বপ্রথম আমাদের জানা দরকার, একটি দ্বীনী মাদরাসার প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা কী ? মাদরাসা হলো এক মহান কর্মশালা, যেখানে মানুষ গড়ার সাধনা হয়, যেখানে দ্বীনের দাঈ এবং ইসলামের সিপাহী তৈরী হয়। মাদরাসা হলো ইসলামী বিশ্বের বিদ্যুৎকেন্দ্র , যেখান থেকে ইসলামী জনপদে , বরং সমগ্র মানব বসতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। মাদরাসা হলো মন ও মস্তিষ্ক এবং অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টি তৈরীর কারখানা। মাদরাসা হলো গোটা বিশ্বের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ এবং সমগ্র মানব জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের মহান কেন্দ্র। সমগ্র বিশ্বের উপর মাদরাসার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, বিশ্বের কোন সিদ্ধান্ত তার উপর কার্যকর হয় না। মাদরাসার সম্পর্ক বিশেষ কোন যুগ , সমাজ এবং বিশেষ কোন ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নয় , নয় বিশেষ কোন কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে। সুতরাং যুগ ও সমাজের পরিবর্তন, ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি, কিংবা সভ্যতার প্রাচীনতা মাদরাসার গতি ও ব্যাপ্তিকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে। না। আমরা যাকে মাদরাসা বলি , একদিকে তার সম্পর্ক হলো সরাসরি মুহাম্মদী নবুয়তের সঙ্গে যা বিশ্বজনীন, সার্বজনীন ও সর্বকালীন। অন্যদিকে তার সম্পর্ক হলো মানুষ ও মানবতার সাথে এবং সেই গতিশীল জীবনের সাথে যা সাগরমুখী নদীর মতই চিরপ্রবাহমান। মাদরাসা হলো নবুয়তে মুহাম্মাদীর চিরন্তনতা এবং মানবজীবনের গতিশীলতার মিলন মোহনা। সুতরাং আধুনিক ও প্রাচীনের বিতর্ক এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতা এখানে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

বন্ধুগণ! মাদরাসার পরিচয় প্রসঙ্গে যদি বলা হয় যে, তা বিগত যুগের স্মারক কিংবা ইতিহাসের ধারক তাহলে এর চেয়ে আপত্তিকর ও অপমানজনক বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি তো এটাকে মাদরাসার 'পরিচয়-সত্তার' বিলুপ্তি সাধন মনে করি। মাদরাসাকে আমি মনে করি সবচে ' সুরক্ষিত ও শক্তিশালী কেন্দ্র এবং গতি ও প্রগতির উচ্ছলতায় এবং উদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। এর এক প্রান্তের সংযোগ হলো নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে, অন্য প্রান্তের সংযোগ হলো জীবন ও জগতের সাথে। মাদরাসা একদিকে নবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তন ঝরনাধারা থেকে 'জলসঞ্চয়' করে, অন্যদিকে জীবনের ফসলভূমিতে 'জলসিঞ্চন' করে। এটা দ্বীনী মাদরাসার সর্বক্ষণের দায় ও দায়িত্ব। মুহূর্তের জন্য যদি সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে তাহলে জীবনের ফসলভূমি শুকিয়ে যাবে, মানুষ ও মানবতা নির্জীব হয়ে পড়বে এবং জীবন ও জগতের সব কিছুতে স্থবিরতা দেখা দেবে।

মাদরাসার নেই কোন ছুটি

নবুয়তে মুহাম্মদীর ঝরনাধারা যেমন কখনো শুকোবে না তেমনি মানবতার পিপাসাও কখনো দূর হবে না। নবুয়তে মুহাম্মদীর কল্যাণ ও ফায়যানে যেমন কৃপণতা ও দানবিমুখতা নেই তেমনি মানবতার প্রয়োজন ও প্রার্থনারও বিরাম নেই। এদিক থেকে বারবার ধ্বনিত হয় 'আল্লাহ দেন, আমি বিতরণ করি'- এই আশ্বাসবাণী, ওদিক থেকে উচ্চারিত হয় 'দাও, আরো দাও'- চাহিদার কাতর ধ্বনি। দুনিয়াতে মাদরাসার চেয়ে কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত সচল প্রতিষ্ঠান আর কী হতে পারে! জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন অসংখ্য জীবনের চাহিদা ও পরিবর্তন অসংখ্য , জীবনের বিচ্যুতি ও পদস্খলন অসংখ্য, জীবনের আশা ও উচ্চাশা অসংখ্য এবং জীবনের প্রতারণা ও প্রতারক অসংখ্য। মাদরাসা যখন এমন সমস্যাসংকুল ও প্রয়োজনবহুল জীবনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে তখন তার অবসর যাপনের অবকাশ কোথায়?

দুনিয়াতে যে কোন মানুষ কাজ ছেড়ে আরাম করতে পারে , যে কোন প্রতিষ্ঠান অবসর যাপন করতে পারে। পৃথিবীতে সবার ছুটি ভোগ করার অধিকার আছে , কিন্তু মাদরাসার নেই কোন ছুটি। প্রতিদিন তার কর্মদিন , প্রতিমুহূর্ত তার ব্যস্ততার মুহূর্ত। দুনিয়ার যে কোন মুসাফির চাইতে পারে একটু আরাম, একটু বিশ্রাম, কিন্তু জীবনের সদা চলমান কাফেলায় মাদরাসা নামের যে মুসাফির, তার কপালে নেই কোন আরাম, তাকে চলতে হবে অবিরাম।

জীবনের গতি কখনো যদি মুহূর্তের জন্য থেমে যেতো , চাহিদা ও প্রয়োজনের সাময়িক অবসান হতো তাহলে মাদরাসারও সুযোগ ছিলো চলার পথে একটু দম ফেলার , একটু জিরিয়ে নেয়ার। কিন্তু জীবন যেখানে সদা গতিশীল, জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজন যেখানে পরিবর্তনশীল সেখানে মাদরাসার কর্মচঞ্চলতায় স্থিরতা ও স্থবিরতার অবকাশ কোথায়? তাকে তো পদে পদে জীবনকে শাসন করতে হবে , জীবনের ভুল-বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং নতুন নতুন ফেতনার সফল মোকাবেলা করতে হবে। মাদরাসা যদি জীবন-কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে , কিংবা কোন মঞ্জিলে এসে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে এবং তন্দ্রায় ঢুলে পড়ে তাহলে জীবনকে সঙ্গ দেবে কে ? মানবতাকে পথ দেখাবে কে? ঝড়-তুফানের অন্ধকারে নবুয়তের আলো দেখাবে কে? হতাশা ও নিরাশার মুখে পায়গামে মোহাম্মদীর চিরন্তন সান্ত্বনাবাণী শোনাবে কে?

মদরাসা যদি কর্মে অবহেলা ও দায়িত্বে শিথিলতা করে, মাদরাসা যদি জীবনের নেতৃত্ব ত্যাগ করে এবং গতিহীন ও স্থবির হয়ে পড়ে তাহলে তা হবে জীবন ও জগতের সাথে এবং মানুষ ও মানবতার সাথে বিশ্বাসভঙ্গের শামিল , যা দায়িত্বশীল ও কর্তব্য সচেতন কোন মাদারাসা কল্পনাও করতে পারে না।

তালিবানে ইলমের মহান দায়িত্ব

বন্ধুগণ! মাদরাসার তালিবে ইলম হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন অতি মর্যাদাপূর্ণ তেমনি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি না, দুনিয়ার কোন দল বা সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এত নাযুক ও সংবেদনশীল কি না। আমার শব্দগুলো আবার চিন্তা করুন , আপনার এক প্রাপ্ত নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে যুক্ত, অন্য প্রান্ত জীবন ও জগত এবং সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত।' এটাই আপনার দায়িত্ব নাযুকতার কারণ এবং এটাই আপনার মর্যাদা ও সৌভাগ্যের উৎস। নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে সম্পর্ক ও সম্পৃক্তি যেমন গর্ব ও গৌরবের এবং মর্যাদা ও সৌভাগ্যের বিষয় তেমনি তা অতি নাযুক ও গুরুভার দায়িত্বেরও বিষয়।

আপনার কাছে রয়েছে ঈমান ও বিশ্বাসের এবং হাকীকাত ও হাক্কানিয়াতের সবচে ' মূল্যবান সম্পদ। এ পরিচিতি-গৌরব ও সম্পদ-অধিকার অনিবার্য ভাবে কিছু কর্তব্য ও দায়-দায়িত্বও আপনার উপর 'আরোপ' করে। আপনার অন্তরের ঈমান ও বিশ্বাস হবে এমন অটল এবং আপনার হিম্মত ও মনোবল হবে এমন অবিচল যে , দুনিয়ার কোন লোভ ও প্রলোভন ঈমান ও বিশ্বাসের কোন বিন্দু থেকেও আপনাকে টলাতে পারবে না। এই ঈমান ও বিশ্বাসকে রক্ষা করার অন্তহীন জাযবা ও উদ্দীপনা যেন আপনার অন্তরে জাগরূক থাকে। এই অমূল্য সম্পদের গর্বে ও গৌরবে এবং কৃতজ্ঞতায় ও কৃতার্থতায় হৃদয় যেন আপনার উপচে পড়ে। এই ঈমান ও বিশ্বাসের সত্যতা ও চিরন্তনতায় এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বকালীনতায় আপনার যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে। এর বিপরীত সবকিছুকে আপনি যেন নির্দ্বিধায় জাহেলিয়াত এবং জাহেলিয়াতের আবর্জনা বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। একদিকে আল্লাহর আহকাম ও বিধান এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে আপনি যেমন سمعنا و أطعنا বলে গ্রহণ করবেন তেমনি অন্য দিকে জাহেলিয়াত এবং তার প্রচারকদের উদ্দেশ্যে আপনার উদাত্ত ঘোষণা হবে

كفرنا يكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

(আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করছি। তোমাদের ও আমাদের মাঝে শুরু হলো চিরস্থায়ী শত্রুতা যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।)

আপনার অবিচল বিশ্বাস হবে এই যে, ইসলামের পথনির্দেশনা এবং নববী শিক্ষার অনুপ্রেরণার মাঝেই রয়েছে ইহ-পরকালের সফলতা ও শান্তি এবং যামানার নয়া তুফানের মোকাবেলায় সাক্ষীনায়ে মুহাম্মদীতেই রয়েছে নাজাত ও

মুক্তি। আপনার আরো বিশ্বাস হবে এই যে, ব্যক্তি ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতি এবং ইজ্জত ও বুলন্দির একমাত্র শর্ত হলো মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য। যেমন কবি বলেছেন

محمد عربی که آبروئے هردو سراست کسے که خاک درش نیست خاك بر سراو

'আমাদের সৌভাগ্যের উৎস মুহাম্মদে আরাবী/ লাঞ্ছনা তার ভাগ্যলিপ্পির জুটেনি তাঁর পদধূলি।

নবুয়তের শিক্ষা-দীক্ষাকেই আপনি ইলমের সারনির্যাস এবং সব সত্যের পরম সত্য রূপে গ্রহণ করবেন এবং এর মোকাবেলায় দুনিয়ার সমস্ত শিক্ষা ও দর্শন এবং চিন্তা ও যুক্তিকে আপনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাওহীদের হাকীকত ও মর্মকে হৃদয়ের গভীরে পরম যত্নের সঙ্গে আপনি লালন করবেন এবং যাবতীয় শিরক ও প্রতিমাতত্ত্বকে যত আড়ম্বরপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা ও দার্শনিক পরিভাষায় তা উপস্থাপন করা হোক- তুচ্ছ বাগাড়ম্বর বলে আপনি তা উপেক্ষা করবেন এবং زخرف القول; (চাকচিক্যপূর্ণ কথার প্রতারণা) বলে উড়িয়ে দেবেন।

সুন্নতের ইত্তেবা হবে আপনার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং আপনার স্থির বিশ্বাস হবে এই যে , মুহাম্মদী তরীকাই হলো শ্রেষ্ঠ তরীকা এবং বিদ 'আত হলো সমস্ত গোমরাহীর গোড়া। মোটকথা আকীদা-বিশ্বাস , চিন্তা-চেতনা, মন-মানস, রুচি ও স্বভাব এবং ইলম ও আমল সর্বক্ষেত্রে আপনি হবেন নবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তনতা , সার্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতার প্রবক্তা এবং তার বাস্তব নমুনা।

তালিবে ইলমের বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা প্রিয় বন্ধুগণ! উম্মাহর সাধারণ লোকদের তুলনায় আপনাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা এই যে, এ সকল হাকীকত ও সত্যের উপর অন্যদের সাধারণ ঈমান এবং মোটা দাগের বিশ্বাসই যথেষ্ট। কিন্তু আপনাদের থাকতে হবে পূর্ণ চিন্তাগত আশ্বস্তি ও চিত্তপ্রসন্নতা। আপনাদের শুধু বিশ্বাসী হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং বিশ্বাসের দা'ঈ ও প্রবক্তা হওয়া জরুরী। অন্যদের ঈমান ও বিশ্বাস আত্মমুখী হতে পারে, কিন্তু আপনাদের ঈমান ও বিশ্বাস হবে বিকাশমুখী যা হাজারো লাখো ইনসানকে ঈমান ও বিশ্বাসের বলে বলীয়ান করবে। কিন্তু তা শুধু তখনই সম্ভব যখন আপনার ঈমান ও বিশ্বাস আবেগ ও উদ্দীপনার সীমানা স্পর্শ করবে এবং চিন্তা ও চেতনার কোষে কোষে প্রবেশ করবে। যখন আপনার অবস্থা হবে এই যে

يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار
'কুফুরিতে ফিরে যাওয়া তার কাছে এমনই ভয়ঙ্কর যেমন জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া

নবুয়তের ইলম ও শিক্ষার সাধারণ জ্ঞান অন্যদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে , কিন্তু আপনার জন্য প্রয়োজন ইলমে নবুয়তের 'ফায়যান' ও প্রবাহ এবং নববী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে হৃদয় ও আত্মার মিলন। এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে 'ফানা' ও আত্মবিলীনতার সর্বোচ্চ মাকাম। তা না হলে দাওয়াতি দায়িত্ব পালনের কথা কল্পনাও করা সম্ভব নয়, বরং বাতিলের শতমুখী আন্দোলন ও আলোড়নের এই তুফানি যুগে ইলমে নবুয়তের প্রেম ও প্রজ্ঞা ছাড়া নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ রক্ষা করাও হবে সুকঠিন।

আত্মিক গুণবৈশিষ্ট্য ও আত্মার আলোকময়তা

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! একথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, নবুয়তে মুহাম্মদী উম্মতের জন্য একদিকে যেমন ইলম ও শিক্ষা এবং আহকাম ও বিধানের অতুলনীয় সম্পদ ভাণ্ডার রেখে গেছে -

فإن الأنبيا لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا هذا العلم

(নবীগণ দিরহাম-দীনারের মীরাছ রেখে যান নি রেখে গেছেন ইলমের মীরাছ।)

এবং এই সম্পদভাণ্ডার তাফসীর , হাদীছ, উছুল, ফিকাহ ও ইলমুল কালামের আকারে উম্মতের কাছে এখনো সুসংরক্ষিত রয়েছে। তেমনি অন্য দিকে নবুয়তে মুহাম্মদী কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য , অনুভব ও উপলব্ধি এবং আত্মিক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার সম্পদও উম্মতের কাছে আমানত রেখে গেছে। ইলমী সম্পদ যেমন প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে এবং আল্লাহ তা 'আলা উলামায়ে উম্মতের মেহনত ও মোজাহাদার মাধ্যমে তার হেফাযাত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন তেমনি আত্মিক সম্পদও নিরবাচ্ছন্ন ভাবে হৃদয় থেকে হৃদয়ে বহমান রূপে চলে আসছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে সেগুলোরও হিফাযাত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

কী সেই গুণ ও বৈশিষ্ট? হৃদয় ও আত্মার কী সেই নূর ও আলো? তার নাম ইয়াকীন ও ইখলাছ, ইশক ও মুহব্বত, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল, দু'আ ও রোনাযারি, আত্মবিলোপ ও আত্মনিবেদন, দুনিয়ার প্রতি মোহমুক্তি ও নিরাসক্তি ইত্যাদি।

নবুয়তে মুহাম্মদী ছিলো ইলম ও আমল, জ্ঞানসাধনা ও আত্মসাধনা তথা যাহির ও বাতিন উভয়ের সম্মিলিত উৎস

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اينه و يزكيهم و يعلمهم الكتب و الحكمة

তিনি ঐ সত্তা যিনি উম্মী জাতির মাঝে পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত ও বিধান তিলাওয়াত করে শোনান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন।

সুতরাং নবুয়তে মুহাম্মদীর শুধু যাহির গ্রহণ করা এবং বাতিন সম্পর্কে উদাসীন থাকা , শুধু ইলম ও আহকাম চর্চা করা এবং ইহসান ও তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন উপেক্ষা করা নায়েবে নবীর শান হতে পারে না। এটা তো হবে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ মীরাছ বা উত্তরাধিকার। নবুয়তের ওয়ারিছ ও নবীর নায়েব রূপে পৃথিবীতে যুগে যুগে যারা দ্বীন-ঈমানের হেফাযাত করেছেন এবং ইসলামের আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন তারা নবুয়তের শুধু একাংশের ধারক ও বাহক ছিলেন না , শুধু ইলমের সাধক ও গবেষক ছিলেন না। নবুয়তের উভয় সম্পদেই তারা ছিলেন সমান সম্পদশালী। ইলম ও আমল এবং জ্ঞান ও অন্তজ্ঞান এক সাথে ধারণ করেই তারা উম্মতের ইমামাত এবং যামানার "কিয়াদাত' করেছেন। ফিতনা ও তুফানের মোকাবেলা করেছেন এবং ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর হিফাযাত করেছেন।

এ যুগেও ইসলামের দাওয়াত, উম্মতের হিদায়াত এবং যুগের সংস্কার ও বিপ্লব সাধন নবুয়তে মুহাম্মদীর শুধু প্রথম অংশ দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। যে সকল মহান পূর্বপুরুষের সাথে সম্পর্ক ও পরিচয়ের গর্বে আপনারা গর্বিত তাঁরাও ছিলেন নবুয়তে মুহাম্মদীর উভয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। দিনে তারা কলমের কালি ঝরাতেন , আর রাতে ঝরাতেন চোখের অশ্রু। দিনের আলোতে তাদের ইলম চর্চার মজলিস হতো সজীব ও জীবন্ত , আর রাতের নির্জনতায় আল্লাহর সাথে হতো তাদের মিলন ও প্রেমনিবেদন। সুতরাং যথার্থ 'নিয়াবাত' ও প্রতিনিধিত্ব এবং 'বিরাছাত' ও উত্তরাধিকারের সর্বোচ্চ মাকাম লাভ করতে হলে আপনাদেরও আত্মনিয়োগ করতে হবে সর্বাঙ্গীনতা অর্জনের সাধনায়। জ্ঞান ও অন্তর্জানের শুভ মিলন ছাড়া শুধু ইলমের বাহার হবে কাগজি ফুলের বাহার , যাতে না আছে সজীবতা , না আছে সুবাস। দুনিয়ার বাজারে কাগজি ফুলের অভাব নেই। আমি-আপনি তাতে বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারবো না। এখানে তো প্রয়োজন নবুয়তের চিরসবুজ উদ্যানের চিরসজীব 'পুষ্পের' যার সুবাসে জাহান হবে সুবাসিত, যার সামনে দুনিয়ার ফুলেরা লজ্জায় মুখ লুকোবে পাতার আড়ালে।

فوقع الحق و بطل ما كانو يعملون

সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তাদের কারসাজি বাতিল হয়ে গেলো।

মাদরাসার অবক্ষয় ও অধোগতি

আমার কথা খোলা মনে গ্রহণ করুন , আমি তো আপনাদেরই একজন। এটা সমালোচনা নয় , আত্মসমালোচনা। আমি বলতে চাই, মাদরাসা এখন সেই 'পুষ্প'-এর সুবাস থেকে প্রায় বঞ্চিত। আগের সেই নূরানিয়াত নেই। সেই নূরানী মানুষ নেই, যাদের দেখে নিন্দুকেরও যবান সংযত হতো , যাদের ছোহবতে মুরদা দিলও যিন্দা হতো। যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম , মাদরাসার বাসিন্দাদের মাঝে দিন দিন তা অবনতির দিকেই চলেছে। যত তিক্ত হোক স্বীকার করতেই হবে যে, কবি যা বলেছেন সত্য বলেছেন। তাই বুকে পাথর রেখে আমাদের তা শুনতে হবে এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কবি বলেছেন

اٹھا میں مدرسه و خانقاه سے نمناك نه زندگی نه محبت نه معرفت نه نگاه
'এখানে আজ নেই জীবনের তরঙ্গ ও প্রেমের জোয়ারনেই অর্ন্তজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি।

ফল এই যে, হাজারো মাদরাসায় এখন আছে লাখো তালিবান, কিন্তু সমাজের অঙ্গনে এবং জীবনের প্রাঙ্গনে তাদের কোন প্রভাব নেই, নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেই। অথচ আগে সংখ্যা ছিলো কম, ধার ও ভার ছিলো অনেক বেশী।

এক সময় এ দেশেই খাজা মাঈনুদ্দীন আজমীরী কিংবা সৈয়দ আলী হামদানী কাশ্মীরী (রহঃ) এর মত সহায় সম্বলহীন এক ফকীর আত্মপ্রকাশ করতেন আর সারা দেশ হৃদয়ের তাপে ও উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো এবং ঈমান ও ইয়াকীনের নূরে নূরানী হতো। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রঃ) মোঘল হুকুমতে একা এক ইনকিলাব এনেছিলেন। তাঁরই নিরব প্রচেষ্টার বরকতে আকবরের সিংহাসনে আমরা দেখি আওরঙ যেবের মত আলিম, ফাকীহ ও দ্বীনদার বাদশাহকে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) বিশাল বিস্তৃত এই হিন্দুস্তানের গতিধারা বদলে দিয়েছিলেন এবং সমগ্র চিন্তা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

মাওলানা মোহাম্মদ কাসিম নানুতবী (রহঃ) এক সর্বগ্রাসী হতাশা ও নৈরাশ্যের মাঝে এবং "পিছু হটা' এক নাযুক সময়ে এত বড় ইসলামী দুর্গ তৈরী করেছেন এবং দ্বীন ও শরীয়তের কংকাল দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। আর এই কিছুদিন আগে হযরত মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) ঈমানের মেহনত এবং দ্বীনী দাওয়াতের যে জায়বা ও হিম্মত এবং উদ্যম ও মনোবল মানুষের মাঝে সঞ্চার করেছেন তা এক কথায় বিস্ময়কর। কবির ভাষায়

جهانے راد گر گوں کر دیك مر و خود آگا ہے
'এক জাহান বদলে দিতেন এক মরদে খোদা

এখন মাদরাসা থেকে বের হয়ে আসা আমাদের ওলামা-ফোযালা এই প্রাণ ও প্রেরণা থেকে , এই জায়বা ও চেতনা থেকে এবং এই রূহ ও রূহানিয়াত থেকে প্রায় শূন্যের পর্যায়ে চলে এসেছে। সেই হৃদয়-সম্পদ থেকে আজ তারা বঞ্চিত, সেই 'কলবী হারারাত ও হৃদয়োত্তাপ থেকে আজ তারা মাহরূম, যা কাওমকে নতুন চিন্তায় ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতো এবং জীবনের পথ ও পন্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে বাধ্য করতো। যুগ ও সময় বড় বাস্তববাদী। এখানে

ফাঁক ও ফাঁকির সুযোগ নেই। এখানে শক্তি উচ্চতর শক্তির কাছেই শুধু আত্মসমর্পণ করে। মস্তিষ্ক উন্নততর মস্তিষ্কের সামনেই শুধু অবনত হয় এবং নিরুত্তাপ হৃদয় উত্তপ্ত হৃদয়ের সংস্পর্শেই শুধু বিগলিত হয়।

তিক্ত সত্য এই যে, এখন মাদরাসা ও তার বাসিন্দাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি যেমন স্থবির তেমনি তাদের হৃদয়বৃত্তিও অবনতিশীল। চিন্তা-চেতনা যেমন নির্জীব, তেমনি আত্মিক শক্তিও নিস্তেজ। বক্তা ও বক্তৃতার এবং লেখক ও লেখার অভাব এখনো নেই। দর্শন ও দার্শনিকের এবং চিন্তা ও চিন্তাবিদের কমতি এখনো নেই, কিন্তু কবি জিগার মুরাদাবাদীর ভাষায়-

آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرہ پہ یقین کا نور تھیں
চোখের তারায় প্রেমের ঝিলিক কোথায়, চেহারায় ঈমানের সে নূর কোথায়

মাদরাসা এক সময় ছিলো জীবন ও জীবনী শক্তির কেন্দ্র, দ্বীন ও ঈমানের রক্ষা-দুর্গ এবং বড় বড় ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের লালনক্ষেত্র, সময়ের প্রয়োজনে যারা জন্ম দিতেন কল্যাণপ্রসূ বিপ্লবের এবং সংস্কার আন্দোলনের। সেদিনের সেই মাদরাসা আজ হতাশা ও নিরাশায় বিপর্যস্ত, অযোগ্যতার অনুভূতি ও হীনমন্যতাবোধে বিধ্বস্ত।

এখন মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্র ও ছাত্রাবাস অনেক হয়েছে, পাঠ্যবই ও পাঠব্যবস্থা বেশ উন্নত হয়েছে, কুতুবখানার সমৃদ্ধি এবং সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু অবক্ষয়েরও চূড়ান্ত হয়েছে। হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে গেছে, আত্মার খোরাক যেন কমে গেছে। দেহ আছে প্রাণ নেই, শব্দ আছে মর্ম নেই, কথা আছে হাকীকত নেই, ছুরত আছে সীরাত নেই, মজলিস আছে ছোহবত নেই। এককথায় সব আছে, কিন্তু কিছুই নেই। তাই কোন দরদী ও সংবেদনশীল মানুষ যখন 'পথ ভুলে' এখানে এই পরিবেশে এসে পড়ে তখন তার শ্বাস রুদ্ধ হয়, দম আটকে যায় এবং সে পালিয়ে বাঁচতে চায়। সাগরের এই নিস্তরঙ্গ চেহারা দেখেই যেন বেদনাভারাক্রান্ত কবি ফরিয়াদ করেছেন

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیی
تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خوان ہے مگر صاحب کتاب نہیں

'আল্লাহ করুন, ঝড়-তুফানের সাথে হোক তোমার পরিচয়/ কেননা তোমার সমুদ্রে জলরাশি আছে, তরঙ্গবিক্ষোভ নেই/ কিতাবের পাতা থেকে অবসর নেই তোমার/তাই তুমি গ্রন্থপাঠক, গ্রন্থকার নও।'

এখন তো মাদরাসায় বসে সৃষ্টিধর্মী ঝড়-তুফানের পরিচয় প্রার্থনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে। কেননা সবখানে সব মাদরাসায় এখন দেখতে পাই ধ্বংসাত্মক ঝড়-তুফানের পূর্বাভাস। এ হলো বাইরের ঝড় তুফান, যা মাদরাসার ভিত কাঁপিয়ে দিতে চায়, এগুলো হচ্ছে লক্ষ্যহীন, চিন্তাহীন ও শিকড়হীন 'আওয়ামী' আন্দোলন যার ধ্বংসাত্মক ঢেউ মাদরাসার চারদেওয়ালের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। তাতেও আমাদের ছাত্রদের ভূমিকা শুধু অনুকরণপ্রিয় তোতাপাখীর।

এটা বড় দুঃখজনক ও মর্মান্তিক বাস্তবতা যে, যে সমস্ত আলোড়ন ও আন্দোলন, যে সমস্ত শোরগোল ও নৈরাজ্য এবং প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের যে সমস্ত রীতি-নীতি ও কর্মকাণ্ড আজ আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জাগতিক বিদ্যালয়গুলোতে অচল ও সেকেলে এবং নিষ্ফল ও ক্ষতিকর রূপে পরিত্যক্ত হয়ে চলেছে সেগুলোই এখন আমাদের দ্বীনী মাদরাসার তালিবানে ইলমের কাছে কদর ও সমাদর লাভ করছে। যারা হবে সময়ের নিয়ন্ত্রক ও যামানার ইমাম, যারা হবে সৃজনশীল চিন্তার ধারক, স্বতন্ত্র আদর্শের বাহক এবং স্বকীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী জামাত, তারাই

হয়ে পড়েছে ধর্মহীন শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্ধ অনুসারী , নীতিহীন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের পূজারী। এটাই যেন তাদের গর্ব ও গৌরব। তাই কবি বড় দুঃখ করে বলেছেন-

کر سکتے تھے جو اپنے زمانہ کی امامت وہ کھنہ دماغ اپنے زمانہ کے ھیں پیرو

'অন্ধকারে আলো ছড়াবার এবং যুগের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা ছিলো যাদের,দেখো হায়। তারাই এখন আঁধারে পথ হারায়, তারাই এখন মাথা দোলায় যুগের ইশারায়'।

আজ আমাদের দ্বীনী মাদরাসায় সবচে' ভয়ংকর ফেতনা ও চিন্তানৈতিক ব্যাধি হলো সর্বব্যাপী এক হীনমন্যতাবোধ , যা ঘুণে ধরা কাঠের মত ভিতরে ভিতরে আমাদের গ্রাস করে চলেছে। আর বলাবাহুল্য যে, কর্মচঞ্চল ও সংগ্রামমুখর এই পৃথিবীতে ঘুণে ধরা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেঁচে থাকা ও টিকে থাকা কখনো সম্ভব নয়।

কেন এ হীনমন্যতা, কোথায় আত্মমর্যাদা?

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!
যুগ ও সমাজের মোকাবেলায় কেন ও কী জন্য আপনাদের এই হীনমন্যতা ? অন্যদের হীনমন্যতা হলো মানসিক দুর্বলতা ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি। কিন্তু আপনাদের হীনমন্যতাবোধের অর্থ হবে দ্বীন ও ঈমানের কমযোরি এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের দুর্বলতা। এর অর্থ হবে গায়বী ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং আসমানী নেযাম ও ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতা , যার পরিণাম-পরিণতি খুবই গুরুতর ও সুদূরপ্রসারী। নববী ইলমের ধারক ও বাহক যারা , ওয়ারিছে নবী ও নায়েবে রাসূল যারা তাদের মনে যদি বাসা বাঁধে তুচ্ছতা ও হীনমন্যতার অনুভূতি তাহলে এর অর্থ হবে এই যে , নবুয়তের মাকাম ও মর্যাদা তাদের জানা নেই। আল্লাহর যাত ও ছিফাতের পরিচয় তাদের কাছে নেহ। অন্তরে ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সম্পদ নেই।

ভাই, আপনারা তো এমন সব ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের উত্তরসূরী যাদের সামনে এসে থেমে যেতো সময়ের গতি , যারা নির্ধারণ করে দিতেন জীবন ও সমাজের রীতি-নীতি , যাদের নূরানিয়াতের সামনে ম্লান হয়ে যেতো সূর্যের দীপ্তি। আপনারা তাদের পদাংক অনুসারী, শেখ সাদীর ভাষায় যারা ছিলেন 'মুকুটহীন সম্রাট'।

যে মহামূল্যবান সম্পদসম্ভার রয়েছে আপনার কাছে পৃথিবীর সব রাজভাণ্ডার তা থেকে বঞ্চিত। আপনার সিনায় রয়েছে ইলমে নবুয়ত ও নূরে নবুয়ত। আপনার চিন্তায় , চেতনায় এবং বিশ্বাসে, ভাবনায় রয়েছে সেই সব মহাসত্য ও চিররহস্য যা বহুদিন হলো মানবতার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মানবজাতি আজ অন্ধকারে ডুবে আছে। বিভিন্ন গোলোযোগ-দুর্যোগ ও ফেতনা-ফাসাদে সবাই এখন দিশেহারা। কিন্তু তালিবানে ইলম! স্থূল দৃষ্টিতে তাদের পরিচয় হলো জীর্ণ দেহ, শীর্ণ বস্ত্র ও রিক্ত হস্ত, কিন্তু অন্তচক্ষু মেলে নিজের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন। হৃদয়-রাজ্য আপনার কত শত সম্পদে পরিপূর্ণ। যিন্দা কলব , যিন্দা রূহ, সজীব হৃদয়, সঞ্জীব প্রাণ। এত বড় সত্য আর কোন কবি কবে কোন্ কবিতায় এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে! শুনুন-

درسینہ تو ماہ تمامی نہادہ اند برخود نظر کشا ز تھی دامنی مرنج
'শূন্য আঁচল দেখে ক্ষুণ্ণ হও কেন তুমি নিজেকে দেখো একবার বুকে তোমার লুকিয়ে আছে চাঁদ পূর্ণিমার'।

জেনে রাখুন, মনস্তত্ত্বের স্বীকৃত সত্য এই যে , ইজ্জত ও যিল্লতি এবং তুচ্ছতা ও মর্যাদার সম্পর্ক হলো মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে। বাইরের জগতের সাথে তার সম্পর্ক খুবই কম। হীনমন্যতা ও তুচ্ছতাবোধ একটি মনস্তাত্ত্বিক

অবস্থার প্রকাশমাত্র। নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে মানুষের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব , সংশয়-সন্দেহ, দুর্বলতা ও অনাস্থা এবং আত্মপরিচয়ের অভাব — এসবেরই অনিবার্য পরিণতি হলো নিজের তুচ্ছতার অনুভূতি ও হীনমন্যতাবোধ। মানুষ নিজেকে নিজে তুচ্ছ ভাবে , মূল্যহীন মনে করে , তারপর সন্দেহে পড়ে যায় যে , সময় ও সমাজ বুঝি তাকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে করছে। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে , নিজের উপর নিজেই সে অবিচার করছে। নিজেই নিজের অবমূল্যায়ন করছে। মনে রাখবেন , নিজেকে যে তুচ্ছ ভাবে, নিজের কাছে নিজের মূল্য যে হারিয়ে ফেলে পৃথিবীর কোন পদ ও সম্পদ তাকে মর্যাদা দিতে পারে না, মূল্যবান বানাতে পারে না। আপন হৃদয়ে যার স্থান নেই, এ জগত সংসারে কোথাও তার স্থান নেই। আপন হৃদয়ের প্রসার ও সংকোচনেই বাইরের জগত সম্প্রসারিত ও সংকোচিত হয়ে থাকে। সুতরাং নিজের হৃদয়কে নিজের জন্য সম্প্রসারিত করুন , জগত নিজেকে মেলে ধরে আপনাকে স্বাগত জানাবে।

মানুষের কর্তব্য হলো আত্মজিজ্ঞাসা করা , নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা নিজের সঙ্গে নিজে সে কী আচরণ করছে ? নিজের হৃদয়ে নিজেকে সে কতটা মর্যাদার আসন দিয়েছে ? নিজেকে যদি সে রিক্ত ও নিঃস্ব মনে করে , দুনিয়ার বাজারে নিজেকে যদি তুচ্ছ ও মূল্যহীন ভাবতে থাকে তাহলে নিক্তির মাপে ওজন করে অভ্যস্ত এই পৃথিবীর কাছে ইজ্জত ও মর্যাদা আশা করা তার উচিত নয়। জ্ঞানে বিজ্ঞানে এবং আবিষ্কারে উদ্ভাবনে অতি অগ্রসর এই পৃথিবীতে বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আরব জাহেলিয়াতের দাতা হাতেম তাঈ কিন্তু এ পরম সত্য আমার আপনার শিক্ষার জন্য তার এক কবিতায় রেখে গেছেন

و نفسك أكرمها فإنك إن تهن / عليك فلن تلقى من الناس مكرما

'বন্ধু! নিজেকে নিজে মর্যাদা দাও। কেননা তোমার চোখে তুমি তুচ্ছ হলে মানুষের মাহফিলে কোন কদর পাবে না তুমি।

প্রিয় বন্ধুগণ! চাঁদ-সূর্যের অস্তিত্বের মতই আমি বিশ্বাস করি যে , শত শত জাতির কোটি কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে আমরা তুচ্ছ নই , নিঃস্ব নই, দুর্বল ও শক্তিহীন নই , অসহায় ও বে-সাহারা নই। কিন্তু সমস্যা এই যে , আমরা আমাদের আত্মপরিচয় ভুলে গেছি। এই আত্মবিস্মৃতিরই পরিণতি হলো আমাদের হীনমন্যতাবোধ।

এ ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা এই যে, আমাদেরকে আত্মসচেতন হতে হবে। নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা অনুধাবন করতে হবে। নিজেদের ভিতরে গচ্ছিত সম্পদের সঠিক খোঁজ নিতে হবে। দুনিয়ার পরিবর্তন আসলে আমাদের দৃষ্টির পরিবর্তন। বাইরের দুনিয়ার সবকিছু আমাদের দৃষ্টির অনুগামী। যেদিন জীবন ও জগত সম্পর্কে এবং নিজেদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন আসবে সেদিন জগত সংসারের সবকিছুতেই পরিবর্তন আসবে। এবং আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাবো যে, হীনমন্যতাবোধের যে ভয়ঙ্কর অপচ্ছায়া আমাদের তাড়িয়ে ফিরছিলো তা কর্পূরের মত উবে গেছে। কবি সত্যই বলেছেন

اور اگر با خبر اپنی شرافت سے اور تیری سپہ انس و جن، تو ھے امیر جنود
'আপন মর্যাদা সম্পর্কে তুমি সচেতন হও তাহলে দেখবেজিন-ইনসান হবে তোমার সিপাহী আর তুমি হবে আমীরে লশকর।

আমাদের বিগত ও সমসাময়িক ইতিহাসে দেখা যায়, যারা বিশ্বজগতে নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে , কী মহামূল্যবান সম্পদ ও মর্যাদাপূর্ণ মাকাম আল্লাহ তাদের দান করেছেন , সারা বিশ্বের সব কিছু তাদের কাছে মনে হয়েছে তুচ্ছ , অতি তুচ্ছ। ফলে দুনিয়ার কোন সালতানাত কখনো তাদের

খরিদ করতে পারে নি। প্রতাপশালী সুলতান ও আমীর-উমরাদের বড় বড় লোভনীয় প্রস্তাব মৃদু হেসে এই বলে তারা ফিরিয়ে দিয়েছেন যে- ঈগল তো নীড় বাঁধে সর্বোচ্চ বৃক্ষের শীর্ষ চূড়ায়।'

মানবজাতির ইতিহাস যদিও বারবার আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিক্রিত মানুষের কলংকে কলংকিত হয়েছে , তবু তা এই মহামানবদের ব্যক্তিত্ব বিভায় উদ্ভাসিত এবং তাদের আল্লাহ-প্রেম ও আত্মসম্মানবোধের কাহিনীতে গৌরবান্বিত হয়েছে। মানবতার শির তাদেরই কল্যাণে চিরউন্নত রয়েছে যারা কর্মে ও বিশ্বাসে নিজেদের শির উন্নত রেখেছেন।

আত্মমর্যাদাশীলদের দ্বারাই জীবনের গৌরব

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! জীবনের স্থিতি ও ধারাবাহিকতার জন্য খাদ্য-বস্ত্র ও উপায়-উপকরণের যেমন প্রয়োজন , এবং মানুষ নিজেই সেগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তেমনি মানবজীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি এবং মানবতার মর্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্য জড়বাদ ও বস্তুপূজার এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন কিছু মর্দে খোদা ও সাধক পুরুষের উপস্থিতি অপরিহার্য, যারা নববী শান ও ওয়ারিছে নবীর আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারেন এবং বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীর মাপ ও পরিমাপ অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করতে পারেন এবং বিভিন্ন জনপদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুনিয়াদারদের এ আওয়ায দিতে পারেন

أتمدونن بمال فما أتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون

'আমাকে তোমরা সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও শোনো, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা ঐ সম্পদ থেকে উত্তম যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন্ তোমরা বরং তোমাদের সম্পদ নিয়ে মেতে থাকো'।

এ আওয়ায যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে , সারা দুনিয়া সেদিন এমন এক নিলামঘর-এ পরিণত হবে , যেখানে বিবেক ও বিশ্বাস এবং ইলম ও ঈমান কোন না কোন মূল্যে খরিদ করা সম্ভব , যেখানে মানুষ ও মানবতা গরু-ছাগলের মত সস্তা দরে কিংবা চড়া দরে বিক্রি হয়। দুনিয়া সেদিন আর মানুষের বাসোপযোগী থাকবে না এবং মানবতার ইজ্জত বলে কিছুই থাকবে না।

এখন মানবতার সম্ভ্রম রক্ষা করা এবং দ্বীন ও শরীয়তের শান বজায় রাখার দায়িত্ব এককভাবে আপনাদেরই উপর অর্পিত। সময়ের উজান পাড়ি দিয়ে আপনাদেরই এগিয়ে আসতে হবে এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য। ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে তো এটা আশা করা যায় না যারা আহার ও বিহার ছাড়া জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা কখনো দাবীই করেনি। এ আশা ও প্রত্যাশা তো শুধু আপনাদেরই কাছে করা যেতে পারে , যাদের পূর্বপুরুষদের কাতারে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) এর মত ইয্যত ও গায়রতের অধিকারী ইমাম, যাদেরকে ভয়-ভীতি এবং লোভ ও প্রলোভনের কোন মূল্যেই খরিদ করতে পারে নি সে যুগের প্রবল প্রতাপান্বিত আব্বাসী হুকুমত। রয়েছেন ইমাম গাযযালী (রঃ) এর মত সাহসী ও বা-হিম্মত আলিম যিনি দরবারে খেলাফাতের ইঙ্গিত অনুরোধ সত্ত্বেও বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে রাজী হননি, যা খেলাফতের পর সর্বোচ্চ ধর্মীয় মর্যাদার বিষয় ছিলো।

রয়েছেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রঃ) এর মত প্রাজ্ঞ ও প্রতিজ্ঞ এবং উচ্চ মনোবলের অধিকারী মানুষ যিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সামনে মাথা নত না করে কারাগারের নির্যাতনকে সাদরে বরণ করেছেন। আপনাদের পূর্বপুরুষদের কাতারে রয়েছেন হযরত মিরযা মাযহার জানেজানী (রহঃ) এর মত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব , যার নামে দিল্লীর বাদশাহ পায়গাম পাঠালেন- 'আল্লাহর দেয়া আমার বিশাল সালতানাত থেকে আপনিও কিছু গ্রহণ করুন। ' আর তিনি জবাব পাঠালেন আল্লাহ তো সারা দুনিয়াকে متاع الدنيا ليل বলেছেন। তা থেকে আপনার ভাগে পড়েছে

সামান্য একটি অংশের রাজত্ব। সুতরাং তা এমন কী আর বেশী যে , আমার মত 'ফকীর' তাতে লোভের হাত বাড়াবে!
একবার তিনি নওয়াব আছেফ জাহ-এর পেশকৃত বাইশ হাজার রুপিয়ার নযরানা ফেরত দিলে নওয়াব নিবেদন করলেন, 'আপনি গ্রহণ করে অভাবীদের মাঝে ডাকসীম করে দিন।

কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, 'দান বিতরণের আদব-কায়দা আমার জানা নেই। আপনি ফেরার পথে দান করে করে যান, দেখবেন ঘরে যাওয়ার আগে তা শেষ হয়ে গেছে। অন্তত ঘরে গিয়ে তো অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। আপনার পূর্বপুরুষদের মাঝে রয়েছেন হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী-এর মত ব্যক্তিও যিনি নওয়াব মীর খান-এর পক্ষ হতে তাঁর খানকাহ-এর বার্ষিক খরচ নির্বাহের জন্য জায়গীর প্রদানের প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم ما میرخان بگونے که روزی مقدر است
'ফকীরী ও অল্পেভুষ্টির ইজ্জত আমি হারাতে পারি না। মীর খানকে বলে দাও রুযি তো নির্ধারিত তাকদীর'।

আরো আছেন মাওলানা আব্দুররহীম রায়পুরী (রহ) এর মত স্বনামধন্য মুদাররিস , যিনি বেরেলী কলেজের আড়াইশ রুপিয়ার 'বেতন' ফেলে দশ রুপিয়ার 'অযীফা' বেছে নিয়েছিলেন এবং লিল্লাহী তালীমকে অধ্যাপনার সম্মানের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছিলেন 'ইলমের খিদমত থেকে যদি বিমুখ হয়ে যাই তাহলে আগামীকাল আল্লাহর কাছে আমি কী জবাব দেবো ? আপনার পূর্বপুরুষদের মাঝে রয়েছেন দারুল উলূম দেওবন্দের 'বানী' ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহ)-এর মত ব্যক্তি যিনি দশ রুপিয়ার ভাতা থেকে দুই রুপিয়া এই বলে বাদ দিয়েছিলেন যে, দুই রুপিয়া আমি আম্মার খেদমতে ব্যয় করতাম। তাঁর ইন্তিকালের পর এটা আমার জন্য অতিরিক্ত, যার হিসাবের দায় থেকে কেয়ামতের দিন আমি বাঁচতে চাই।

আপনার নিকট অতীতের পূর্বপুরুষদের মাঝেও রয়েছেন এমন এমন নিবেদিতপ্রাণ মুদাররিস যারা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় প্রস্তাবের মোকাবেলায় মাদরাসার সামান্য অযীফাকে এবং উস্তাদ ও শায়খের ছোহবত ও সান্নিধ্যকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন এবং অনটন ও কৃচ্ছতার মাঝেই জীবন কাটিয়েছেন। সুতরাং আরব কবি ফারাযদাকের এই 'আত্মগৌরবী' কবিতা বলার অধিকার অবশ্যই আপনার আছে

أولئك آبائي فجئني بمثلهم / إذا جمعتنا يا جرير المجامع

'এই স্বনামধন্যরা হলেন আমার পূর্বপুরুষ। হে জারীর! আমাদের জমজমাট মজলিসে তাদের একজনমাত্র তুলনা পেশ করো দেখি!

বন্ধুগণ! আমার কথায় এমন যেন মনে না করেন যে, সমাজ ও সময়ের পরিবর্তন, জীবনযাত্রার চাহিদা ও প্রয়োজন এবং হিম্মত ও মনোবলের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার অনুভূতি আমার নেই, কিংবা এ যুগে আমি সে যুগের আত্মত্যাগ ও কোরবানি চাই। না , এমনকি নিকট অতীতের নমুনাও আমি আপনাদের কাছে দাবী করি না। তবে এ কথা অবশ্যই বলবো যে, যে পথ ও পন্থা এবং যে জীবন ও চিন্তা আপনারা গ্রহণ করেছেন , নিঃসন্দেহে তা মেহনত ও মোজাহাদা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং কৃচ্ছতা ও অল্পেভুষ্টির দাবীদার। এ পথ উচ্চ মনোবল ও বুলন্দহিম্মতের পথ। জীবনের জন্য যে পথ আপনারা গ্রহণ করেছেন , কিংবা তাকদীরে ইলাহী আপনাদের জন্য নির্বাচন করেছে তা পার্থিব উচ্চাভিলাষ পূরণের এবং জাগতিক উন্নতি সাধনের পথ নয়। এ পথে তো আপনাকে শুনতে হবে সমাজের কটাক্ষ যে

قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

"এর আগে আমাদের নযরে তুমি তো ছিলে ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। কিন্তু যে পথ ধরেছো তাতে তো অভাবই নিত্যসঙ্গী তোমার, আর ভবিষ্যত হলো অন্ধকার। অথচ দেখো অমুকের পুত্র তোমারই সমবয়সী কোথায় চলে গেছে, আর তুমি কোথায় পড়ে আছো!

এধরনের আরো বহু কথা ও কটাক্ষ আপনাকে শুনতে হবে। এ পথে আপনাকে প্রথম যে পাঠ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তা হলো

و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير و أبقى

'তাদেরকে দুনিয়ার যে চাকচিক্য ভোগ করতে দিয়েছি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সেদিকে চোখ তুলে তাকিও না। কেননা তোমার প্রতিপালকের দেয়া রিযিকই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

কিন্তু এর ফল ও প্রতিফল কী? তাও শুনুন

و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا باياتنا يوقنون

তারা যে ছবর করেছে আর আমার আয়াতকে বিশ্বাস করেছে তাই তাদেরকে আমি পথপ্রদর্শনকারী ইমাম বানিয়েছি।

এই ঈষণীয় আধ্যাত্মিক স্তর সম্পর্কেই মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন-

تاکہ بے پردہ ز حق آید سلام معدہ را بگزار سوئے دل خرام

'উদর চিন্তা ত্যাগ করো, হৃদয়ের পথে যাত্রা করো, পর্দার আড়াল ছেড়ে তোমার কাছে নেমে আসবে আসমানী সালাম।

বুঝতে শিখুন যামানার নিস্বতা

বন্ধুগণ! জীবন সংগ্রামের পথে হীনমন্যতার যে অনুভূতি আজ আপনাদের যন্ত্রণাদগ্ধ করছে তার একটা কারণ তো এই যে, নিজেদের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আপনারা অবগত নন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য আগেই বলেছি।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজকের পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কেও আপনাদের সঠিক ধারণা নেই। জীবনের গুরুভারে আমাদের সময় ও সমাজ কতটা বিপর্যস্ত ও অসহায় এবং হৃদয় ও আত্মার জগতে কেমন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত তা আপনাদের জানা নেই। অজ্ঞতার কারণে বাইরের চাকচিক্যে আপনাদের মনমস্তিষ্ক এমনই প্রভাবিত যে , করুণার চোখে না দেখে পৃথিবীকে আপনারা কামনার চোখে দেখছেন। আধুনিক জীবনের বাহ্যরূপ তো দেখেছেন , স্বরূপ দেখেন নি। কাছে থেকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, এই যুগ, এই সমাজ কতটা দেউলিয়া ও হতাশাগ্রস্ত।

সবচেয়ে বড় কথা, সময় ও সমাজ নিজেও তার দেউলিয়াত্ব তীব্রভাবে অনুভব করছে। সওদাগরের সব মুদ্রা জাল প্রমাণিত হয়েছে, শিকারীর সব তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং দূর থেকে দেখা মরুপথের 'জলতরঙ্গ' মরীচিকা সাব্যস্ত

হয়েছে। এককথায় সব দর্শন ও মতবাদ এবং জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সব স্বপ্ন আজ দিবা-স্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

আপনার কাছে নবুয়তে মুহাম্মদীর যে জ্ঞানভাণ্ডার ও সত্য-সম্পদ রয়েছে নিজের অযোগ্যতা ও স্থূলদৃষ্টির কারণে সমাজের সামনে তা তুলে ধরতে আপনি সংকোচ বোধ করছেন। কারণ আপনার ধারণা , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এবং শিল্প ও অর্থনীতির এ বিপ্লবের যুগে উটের যুগের কথা কীভাবে বলা যায় ? অথচ বাস্তবতা এই যে, পৃথিবী ও তার মানব সমাজ সেগুলোর জন্যই এখন ব্যাকুল ও সতৃষ্ণ। বিদ্যায় , বুদ্ধিতে ও শিল্পে, শক্তিতে উন্নত সব জাতি আজ এমন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক্ষায় আছে যারা তাদেরকে জীবনের নতুন পথ দেখাবে, অনন্ত যাত্রার পাথেয় যোগাবে এবং মুহাম্মদে আরাবীর বাণী ও পায়গাম শোনাবে।

কবির ভাষায়-

همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف بامید آن که روزی بشکار خواهی آمد

'বিশুষ্ক মরুভূমির প্রতিটি তপ্ত বালুকণা তাকিয়ে আছে মেঘের দিকেকখন নেমে আসবে বৃষ্টিধারা! শীতল হয়েতৃপ্ত হবে মরু সাহারা! [১]

আসলম সম্পদ ইলমে নববী

অন্তর্দৃষ্টির অভাবে দ্বীন ও শরীয়তের যে বাণী ও বক্তব্যকে আপনি সাধারণ ভাবছেন , আপনার কাছে যার গুরুত্ব নেই, বড় বড় স্কলার ও বিদগ্ধ পণ্ডিৎকে আমি তা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ ও গ্রহণ করতে দেখেছি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সামনে যখনই নবুয়তের শিক্ষা ও দীক্ষার আলোচনা এসেছে পরিষ্কার মনে হয়েছে , বহু উঁচু থেকে অনেক নীচের মানুষকে যেন সম্বোধন করা হচ্ছে এবং নতুন কিছুর সাথে নতুন পরিচয় যেন তারা লাভ করছে। এমন কিছু যা তাদের কান এত দিন শুনে নি , কিন্তু শোনার জন্য উৎকর্ণ ছিলো। দুনিয়ার বাজারে দুনিয়ার পণ্যসম্ভার নিয়ে আপনি হাজির হতে চান , তারপর যদি بضاعتنا ردت إلينا (আমাদের সম্ভার এনেছো আমাদের কাছে) বলে তারা তা ফিরিয়ে দেয় তাহলে কোন যুক্তির জোরে আপনি যামানার শীতল আচরণের অভিযোগ করবেন?

জীবনের যন্ত্রণায় দগ্ধ পৃথিবী তো আশা করে যে , আপনি তাকে নবুয়তের বাণী ও পায়গাম এবং তত্ত্ব ও হাকীকত শোনাবেন, নবুয়তের পথ ও পন্থা এবং আহকাম ও বিধান বোঝাবেন। পৃথিবী এখনো নবী ও নবুয়তের সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত। মানুষের মেধা ও প্রতিভা এবং চিন্তা ও চেতনা এখনো তা গ্রহণ করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত , যেমন ছিলো খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের পৃথিবীর সীমাবদ্ধ পরিবেশে। আপনার কাছে গ্রীকদের প্রকৃতি বিজ্ঞান , পদার্থ বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞানের যে ক'টি ছেঁড়া পাতা আছে, তার মোকাবেলায় ইউরোপের কাছে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি এবং পরীক্ষা ও নিরীক্ষার বিশাল ভাণ্ডার। সুতরাং এটা বাস্তব সত্য যে , আজকের বিজ্ঞানগর্বী ইউরোপকে গ্রীকদর্শনের তত্ত্ব জটিলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মতা দিয়ে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। কেননা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং সে তার জীবন ও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

---

[১] কবিতাটির শাব্দিক তরজমা এই মরুভূমির ক্ষুধার্ত প্রাণী বিষণ্ণ বদনে বসে আছে উন্মুখ হয়ে/ এ আশায় যে আজ না হোক কাল কোন না কোন শিকার আসবে নিশ্চয়।

কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের যে ইলম ও হাকীকত এবং রূহানিয়াত ও নূরানিয়াত আপনার কাছে রয়েছে ইউরোপ-এশিয়া এখনো তা থেকে বঞ্চিত এবং সে জন্য তৃষ্ণার্ত। আপনার চিন্তা-গবেষণার এবং জ্ঞানচর্চার কিছু না

কিছু জবাব আছে তাদের কাছে , কিন্তু নবুয়তের মু 'জিযা ও অলৌকিকত্বের কোন জবাব নেই। আপনি আপনার আসল শক্তি ও সম্পদ নিয়ে আগে বাড়ুন এবং পূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে যিন্দেগীর ময়দানে নেমে আসুন। এখানে আপনার কোন প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আপনার কাছে মানবতার নামে যে দাওয়াত ও পায়গাম আছে , আপনার কাছে ইলম ও হাকীকাতের এবং অন্তর্জ্জান ও মা 'রিফাতের যে ঝরণাধারা রয়েছে এবং যে মহান সত্তার সঙ্গে আপনার গোলামির সম্পর্ক-সৌভাগ্য রয়েছে তারপর তো আপনি অবশ্যই সগৌরবে বলতে পারেন

عجب کیا گرمہ و پرویں مرے نخچیر ہو جائیں کہ بر فتراك صاحب دولتے بستم سر خودار
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا

'আশ্চর্য কী চাঁদ-তারা যদি হয় আমার অনুগত! আমি তো গোলাম তাঁরযিনি সবার সেরা, যিনি নবীকুল শিরোমণি। পথের ধুলিকণাকে যিনি দান করেছেন সিনাই মরুর বিশালতা। জীবনের সঙ্গে ইসলামী ইলমের সংযোগ রক্ষায় পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টা।

প্রিয় বন্ধুগণ! শুরুতেই আমি বলেছি, আপনাদের সম্পর্কের এক প্রান্ত নবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে যুক্ত। এই সংযুক্তির দায় ও দায়িত্ব কী কী? এতক্ষণ আমি সে বিষয়েই বিশদ আলোচনা করেছি।

আমি আরো বলেছি যে , আপনাদের সম্পর্কের অপর প্রান্ত মানব-জীবনের সঙ্গে যুক্ত। এখন আমি আরয করতে চাই, জীবনের সঙ্গে এই সংযুক্তি আপনাদের উপর কী কী দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে এবং সে জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন? এবং এ সম্পর্কের হক কী ভাবে আপনারা আদায় করতে পারেন?

বন্ধুগণ! নবুয়তে মুহাম্মদী আমাদেরকে যে ইলম ও মহাজ্ঞান, যে হাকীকত এবং যে বিধান ও মূলনীতি দান করেছে তাতে তো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা সম্ভব নয় , আর আপনাদের মহান পূর্বসূরীদের তাজদীদী অবদানও এটাই যে , তাঁরা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনের কোন সুযোগ দেন নি, বরং পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় হুবহু তা আমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন।

তবে সেই সাথে এ বাস্তব সত্যও মনে রাখতে হবে যে , আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ প্রত্যেক যুগে নুবয়তের ইলমী আমানতকে জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টাও পূর্ণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও প্রতিভা এবং শ্রম ও সাধনা দ্বারা নবুয়তের ইলম ও হাকীকত এবং আহকাম ও বিধানের সমগ্র সম্পদসম্ভারকে সচল ও জীবন্ত এবং কার্যকর ও সার্বজনীন জীবন-বিধান বলে প্রমাণ করেছেন এবং এগুলোর এমন পূর্ণাঙ্গ ও জীবনধর্মী ব্যাখ্যা-পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন যে , সমকালীন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা সহজেই তা আত্মস্থ করতে পেরেছে। নিজেদের সময় ও সমাজ এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের মাঝে এবং দ্বীন ও শরীয়তের শিক্ষা-দীক্ষা এবং আহকাম ও বিধানের মাঝে কোন দূরত্ব ও পার্থক্য তারা অনুভব করে নি। দ্বীন ও শরীয়তের মৌল উদ্দেশ্য ও প্রত্যক্ষ বিধানের ব্যাপারে আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিলো পর্বতের অটলতা এবং ইস্পাতের দৃঢ়তা , কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রকাশ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছিলো পুষ্পের কমনীয়তা এবং মখমলের কোমলতা বস্তুত সাইয়েদুনা আলী (রাঃ) এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও হেদায়াতের উপর তাঁদের পূর্ণ আমল ছিলো

كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله و رسوله ؟
'মানুষের সঙ্গে তাদের চিন্তা ও বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী কথা বলো। তোমরা কি চাও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক!

মোটকথা, যুগের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর অনুযায়ী দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের দায়িত্ব তারা পালন করেছেন এবং সময়ের প্রয়োজন ও প্রবণতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন। তৃতীয় শতকে খলীফা আল-মামুন ও আল-মু'তাছিমের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জোয়ার এলো এবং মু 'তাযিলা মতবাদ ও চিন্তাধারায় সমকালীন চিন্তা-চেতনা ও মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হলো। মু 'তাজিলাদেরই মনে করা হতো চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির একক প্রতিনিধি এবং ই'তিযাল (মুতাযিলাদের মত ও মতবাদ)ই ছিলো যুগের ফ্যাশন ও মুক্তবুদ্ধির পরিচায়ক ।

সেই কঠিন যুগ সন্ধিক্ষণে ইমাম আবুল হাসান আশ 'আরী (রহঃ) মু 'তাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইজারাদারির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তাদের মোকাবেলায় তাদেরই ভাষা ও পরিভাষায় এবং তাদেরই রীতি ও পন্থায় দ্বীন ও শরীয়তের বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করেছিলেন। আর যেহেতু পারিভাষিক অভিনবত্ব ও শৈলীগত বৈশিষ্ট্যই ছিলো মু'তাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ও চিন্তানৈতিক নেতৃত্বের বুনিয়াদ সেহেতু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম জাহানে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক 'তেলেসমাতি' ভেঙ্গে গেলো এবং দ্বীন ও শরীয়তের পরিমণ্ডলে যে সর্বগ্রাসী হীনমন্যতাবোধ ছড়িয়ে পড়ছিলো হঠাৎ তা থেমে গেলো এবং হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আবু বকর ছায়রাফী (রহঃ) এর মন্তব্য হলো 'মু'তাযিলারা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো , আল্লাহ তা 'আলা তাদের মোকাবেলায় শায়খ আবুল হাসান আশা 'আরীকে পয়দা করলেন , আর তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ মেধা ও যুক্তিকুশলতা দ্বারা তাদের থামিয়ে দিলেন।

এই যুগান্তকারী অবদানের কারণেই আল্লামা আবু বকর ঈসমাঈলী-এর মত বিদগ্ধ গবেষক তাঁকে 'মুজাদ্দিদীনে উম্মতের' কাতারে শামিল করেছেন। ইমাম আবুল হাসান আশ 'আরী (রহঃ) এর পর তাঁর চিন্তাধারার অনুসারী আলিমগণ তাঁর অসমাপ্ত কর্ম-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন এবং সেই ধারাবহিকতায় কাযী আবু বকর বাকিল্লানী ও আবু ইসহাক ইসফারাঈনী-এর মত জগদ্বরেণ্য কালামবিশারদ এবং আল্লামা আবু ইসহাক শীরাযী ও ইমামুল হারামাঈন-এর মত স্বনামধন্য শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব ঘটলো, যাদের যুগোপযোগী কীর্তি ও কর্মের কল্যাণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইলমী শান ও চিন্তাগত শ্রেষ্ঠত্ব বহাল হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রীকদের জ্ঞানভাণ্ডার আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো এবং বাতেনী সম্প্রদায় ও দার্শনিক সমাজ দর্শন শাস্ত্রের উপর এমন ঐশ্বরিক পবিত্রতা আরোপ করেছিলো যে, মুসলিম সমাজে সেটাই জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির এবং হক ও সত্যের মাপকাঠি হয়ে গেলো।

এদিকে ইলমে কালামের মহল যারা হবেন সবচেয়ে যুগসচেতন ও জাগ্রতমস্তিষ্ক তারাই স্থবিরতা ও অনুকরণপ্রিয়তার শিকার হলেন। তাদের অনমনীয় দাবী ছিলো এই যে , আশ'আরী ও মাতুরীদী আকায়েদ দাড়ি-কমাসহ মানতে হবে। অর্থাৎ তাদের ভাষা ও পরিভাষা এবং যুক্তিপ্রয়োগ পদ্ধতিও হুবহু অনুসরণ করতে হবে। অথচ যুগ ও সময়ের দাবী ছিলো নতুন প্রমাণ ও প্রমাণপদ্ধতির এবং নতুন ইজতিহাদ ও চিন্তাশক্তির।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহঃ) এর যুগ ছিলো দর্শনশাস্ত্রের শৈশব যুগ , যখন মুসলিম জাহানে তার সবেমাত্র পরিচয় গড়ে উঠছিলো। কিন্তু পঞ্চম শতক ছিলো দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণ যৌবনকাল এবং জীবন ও সমাজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিলো নিরঙ্কুশ। তাই তখন প্রয়োজন ছিলো এক নতুন ইলমী ব্যক্তিত্বের , নতুন চিন্তা-চেতনার এবং নতুন ইজতিহাদ ও নতুন ইলমুল কালামের। এজন্য আল্লাহর গায়বী নেযাম ইমাম গাযযালী (রহঃ) কে তৈয়ার করেছিলো। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ) তাঁর গবেষণা গ্রন্থে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস এবং নীতি ও মূলনীতিগুলো নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পদ্ধতিতে আলোচনা করলেন এবং সেগুলোর প্রমাণকল্পে এমন যুক্তি ও ভিত্তি উপস্থাপন করলেন যা সে যুগের ধারা ও প্রবণতার বিচারে অধিকতর প্রভাবক ও হৃদয়গ্রাহী ছিলো। তাঁর যুক্তি-অবতারণা ও প্রমাণ-পর্যালোচনার অভিনব রীতি ও পদ্ধতি নতুন প্রজন্মের অন্তরে দ্বীন ও শরীয়তের মর্যাদা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেছিলো এবং হাজারো অস্থির চিত্ত ও বিদ্রোহী মস্তিষ্ককে শান্ত ও আশ্বস্ত করেছিলো।

কালামশাস্ত্রীয় মহল যদিও তখন ইমাম গায্যালীর অবদানের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে পারেনি , বরং ইলমুল কালামের সনাতন চিন্তা-রেখা থেকে সরে আসায় তাঁর সমালোচনাই করেছে এবং ইমাম সাহেবও فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة নামক কিতাবে তার জবাব দিয়েছেন, কিন্তু অবশেষে ইসলামী জাহানকে তাঁর এ গৌরবময় 'তাজদীদী' অবদান স্বীকার করতে হয়েছে।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) যখন দেখলেন যে , দর্শন ও দর্শন-পূজারীদের বক্তব্য খণ্ডনের জন্য সরাসরি মূল উৎস অধ্যয়নের মাধ্যমে দর্শন শাস্ত্রের সুগভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনার যোগ্যতা লাভ করা প্রয়োজন তখন নির্দ্বিধায় তিনি দর্শনচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। (আলমুনকিয মিনাদ-দালাল কিভাবে তাঁর বক্তব্য মতে) দীর্ঘ দু'বছর তিনি দার্শনিকদের জ্ঞান-গবেষণা এবং মত ও মতবাদ সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন এবং বাতেনী সম্প্রদায়ের আকায়েদ ও বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি অর্জন করেছেন। এভাবে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর প্রথমে তিনি 'মাকাছিদুল ফালাছিফা' এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাহাফাতুল ফালাসিফা কিতাবে তাঁর নতুন অবদান ছিলো এই যে , এতদিন ইসলামের পক্ষ হতে কালামশাস্ত্রীয় আলিমদের বক্তব্য ছিলো শুধু আত্মরক্ষামূলক, যা চিরকাল দুর্বল পন্থা বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ইমাম গায্যালী (রহঃ) প্রথম বারের মত দর্শনশাস্ত্রের কাঁচমহলে আঘাত হেনেছিলেন এবং পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রীয় ইতিহাস লেখকদের মন্তব্য মতে একশ বছর পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের প্রাসাদ গাযযালীর হামলায় কম্পমান ছিলো। প্রায় নব্বই বছর পর দার্শনিক সমাজ ইবনে রুশদের তাহাফাতুত তাহাফাহ' এর মাধ্যমে ইমাম গায্যালীর কিতাবের জবাব পেশ করেছে।

ইমাম গায্যালীর পর প্রয়োজন ছিলো এমন এক ব্যক্তিত্বের যিনি দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিমূলে আরো সুশৃঙ্খল আঘাত হানবেন এবং অকাট্যভাবে প্রমাণ করবেন যে , দর্শনশাস্ত্রের সমগ্র ব্যবস্থা ও কাঠামো অনুমাননির্ভরতা ও 'যুক্তি-কল্পতা' ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কঠিন ও জটিল দায়িত্ব পালনের জন্য যেমন প্রয়োজন ছিলো দর্শনশাস্ত্রের সুগভীর জ্ঞান ও ব্যাপক পড়াশোনার তেমনি প্রয়োজন ছিলো কুশলী ও সমালোচক মস্তিষ্কের এবং সাহসী ও শক্তিশালী কলমের। এ কাজের জন্য শায়খুল ইসলাম আল্লামা হাফেয ইবনে তায়মিয়া আগে বাড়লেন। الرد على النطقيين সহ বিভিন্ন গ্রন্থে জোরালো যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তিনি দর্শনশাস্ত্র ও তার পুরো চিন্তাকাঠামোকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে দিলেন। তাঁর ইজতিহাদী গ্রন্থসমূহ এখনো যুগের চিন্তাকে নতুন খোরাক এবং মানুষের হৃদয়কে নতুন আস্থা ও বিশ্বাস এবং ভাব ও ভাবনাকে নতুন উদ্যম ও সজীবতা দান করে।

এদিকে দর্শন ও ইলমুল কালাম- উভয়ের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডে এক ধরনের স্থূল বুদ্ধিবাদিতা ও যুক্তিপ্রবণতা বিস্তার লাভ করলো, যার ফলে ইসলামী জাহানে এ ভুল ধারণা শিকড় গেড়ে বসলো যে , চিন্তাচর্চা ও যুক্তি প্রয়োগই হলো ঈমান ও বিশ্বাস এবং জ্ঞান ও সত্য লাভের একমাত্র পথ। এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী কলম-জিহাদের সূচনা করলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অমর গ্রন্থ 'মছনবী' ছিলো সপ্তম শতাব্দীর চিন্তা ও বুদ্ধির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হৃদয় ও আত্মার এক অনুপম প্রতিবাদ। বস্তুত মছনবী শুধু ইলমুলকালামের একটি ইজতিহাদি কিতাবই নয়, বরং এক নতুন ইলমুল কালামের এবং হৃদয় ও ভাবধর্মী যুক্তিপ্রয়োগের নতুন বুনিয়াদ। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস এবং আহকাম ও বিধানের যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য তিনি নতুন ধারার নতুন নতুন যুক্তি প্রমাণ এবং নতুন নতুন উদাহরণ পেশ করলেন, যা যুগপৎ হৃদয় ও আত্মাকে এবং চিন্তা ও মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এবং উভয়ের ভ্রান্তি দূর করে সত্যের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে। মছনবীর প্রভাব ও হৃদয়গ্রাহিতা এখনো বহাল রয়েছে এবং দর্শনপ্রভাবিত মহলের জন্য এখনো তা অব্যর্থ আঘাত রূপে বিবেচিত হয়।

মাওলানা রূমী ও হাফেয ইবনে তায়মিয়ার পর দর্শনশাস্ত্র এক নতুন মোড় নিলো। অর্থাৎ চরিত্র ও নৈতিকতা এবং তাছাউফ ও আধ্যাত্মিকতারও সীমানা ডিঙ্গাতে শুরু করলো এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও নাক গলাতে শুরু করলো। দর্শনের এই সীমা লঙ্ঘন ও অন্যায় হস্তক্ষেপ রোধ করার জন্য এখন শুধু ইলাহিয়াতের আলোচনা এবং ইলমুল কালামের চর্চা যথেষ্ট ছিলো না।

দর্শনের এই সর্বমুখী আগ্রাসন রোধ করা এমন ব্যক্তির পক্ষেই শুধু সম্ভব ছিলো যিনি গ্রীকদের ইশ্বরতত্ত্বের পাশাপাশি তাদের নীতিবিজ্ঞান এবং মিসরের নব্য প্লেটোবাদ এবং ভারতবর্ষের যোগবাদ এবং মধ্যযুগের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান ও বিচারক দৃষ্টির অধিকারী হবেন। সেই সঙ্গে দর্শন ও আধ্যাত্মবাদ , নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতিশাস্ত্র এবং ইসলামের অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কেও তার অধ্যয়ন ও জানা-শোনা ব্যাপক ও গভীর হবে। এ পর্যায়ে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ)-এর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলো এবং তিনি যথাক্রমে ও حجة الله البالغة ও إزالة الخفا -এর মত অমর গ্রন্থ লিখে ইসলামের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ এঁকে দিলেন এবং বুদ্ধিবাদী মহলে ইসলামের ইলমী শান ও জ্ঞান-প্রভাব এবং ইসলামী উলূমের চিরন্তনতা এবং আলিম সমাজের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তারের পর নতুন নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিলো। খৃস্টান মিশনারী ও ধর্মপ্রচারকরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হামলা শুরু করলো এবং ইসলামী উম্মাহর আলিম সমাজকে মোকাবেলার 'দাওয়াত দিলো। এর সফল মোকবেলার জন্য বাইবেলীয় সুসমাচারগুলোর গ্রন্থনার ইতিহাস ও ব্যাখ্যা-ভাষ্য এবং ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের বিরোধ সম্পর্কে সরাসরি অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন ছিলো। এ ক্ষেত্রেও আলেম সমাজেরই এক বিরল ব্যক্তিত্ব ময়দানে এলেন এবং إظهار الحق এর মত কালজয়ী কিতাব লিখে খৃস্টধর্ম প্রচারের মুখে বাধার প্রাচীর তুলে দিলেন। পরে একই উদ্দেশ্যে তিনি إزالة الأوهام নামে আরেকটি কিতাব লিখেছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিতাব দু'টিকে ইসলামী জাহানে অতুলনীয় মনে করা হয়। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের কাছে এখনো তা লা-জওয়াব হয়ে আছে।

অন্য দিকে ভারতের আর্য সমাজ উপনিবেশবাদী বৃটিশ সরকারের প্ররোচনায় ইসলামের ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ শুরু করলো এবং বিশ্বজগতের আদিত্ব- অনাদিত্ব , আল্লাহর যাত ও ছিফাত , আল্লাহর কালাম, মৃত্যুপরবর্তী জীবন, কেবলা নির্ধারণ এবং হায়াতুন্নবী-এর উপর যুক্তিগত প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করলো। তাদের প্রশ্নখগুনের জন্য কালাম শাস্ত্রের সনাতন যুক্তি-প্রমাণ যেমন পূর্ণ কার্যকর ছিলো না , তেমনি প্রাচীন যুক্তি-উপাত্ত ও উপাস্থাপন শৈলীও ফলদায়ক ছিলো না। বস্তুত এটা ছিলো এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা , যার মোকাবেলার জন্য হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহঃ) নতুন এক ইলমুল কালামের গোড়াপত্তন করলেন। তিনি সহজ-সরল ভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সাধারণ উদাহরণ এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা কঠিন ও জটিল ইলমী ও বুদ্ধিগত বিষয়ের সমাধান উপস্থাপন করলেন। তাঁর রচিত 'তাকরীরে দিল পাযীর ' 'হুজ্জাতুল ইসলাম' 'আবেহায়াত' ও 'কিবলানোমা কিতাবগুলো অসাধারণ মেধা, বিশুদ্ধ বোধ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচায়ক।

অন্যদিকে উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে পাঞ্জাবে কাদিয়ানি ফিতনা মাথাচাড়া দিলো। এটা ছিলো নবুয়তে মুহাম্মদীর বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ এবং ইসলামের সমগ্র আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা কাঠামোকে 'ডিনামাইট' করে (আল্লাহ না করুন) তার ধ্বংসাবশেষের উপর নয়া নবুয়ত প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস। এই ভয়ঙ্কর ফেতনার মোকাবেলার জন্য কতিপয় দূরদর্শী ও মুখলিছ আলিমে দ্বীন ময়দানে এলেন। তাঁদের মাঝে নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী এবং মাওলানা সৈয়দ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) এর নাম ও কীর্তি ছিলো সবচেয়ে উজ্জ্বল।

জীবনকে সঙ্গ দান এবং যুগের চাহিদা পূরণ

প্রিয় বন্ধুগণ! এত বিশদ বিবরণ পেশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা যেন বুঝতে পারেন যে, ওলামায়ে উম্মতের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মস্তিষ্ক এবং তাঁদের খিদমতি জায়বা কখনো কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে স্থির থাকে নি এবং কখনো তাঁরা চিন্তা-বন্ধাত্বের শিকার হননি, বরং সব সময় তাঁরা ইলমের চলমান কাফেলায় আগুয়ান ছিলেন। সময় ও সমাজের স্পন্দিত শিরা থেকে তাঁদের হাত কখনো সরে যায় নি, বরং বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত তার স্পন্দন ও গতি-প্রকৃতি তাঁরা অনুধাবন করেছেন। জীবনের স্বভাব পরিবর্তন এবং সময়ের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে কখনো তাঁরা বে-খবর হননি, বরং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ, করেছেন। ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর খিদমত ও রাহবারির জন্য সময়ের দাবী হিসাবে যখন যে পথ ও পন্থাকে এবং যে কর্মপদ্ধতিকে তাঁরা কার্যকর ও কল্যাণকর মনে করেছেন নিঃসংকোচে তা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর প্রতি বিশেষ কোন চিন্তা ও পন্থা এবং নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁদের কোন দায়বদ্ধতা ছিলো না।

মিসরে ও ভারতবর্ষে যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও সাহিত্যের পথে ইসলামের উপর হামলা শুরু হলো। বিদ্বেষী পশ্চিমা লেখক ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের পক্ষ হতে ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণ্য যুগ ও যুগনায়কদের সমালোচনা শুরু হলো এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে বিকৃত ও কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা শুরু হলো তখন সমসাময়িক আলিম সমাজ থেকেই স্বনামধন্য লেখক-সাহিত্যিক ও কলম-মুজাহিদগণ ময়দানে এসেছেন এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দস্যুতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উম্মাহকে তাঁরা এমন কালজয়ী গ্রন্থসম্ভার উপহার দিয়েছেন যা শুধু ইসলামিয়াতের ক্ষেত্রেই নয়, বরং উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ছিলো অনন্য। আলিম সমাজ তাঁদের যুগোপযোগি চিন্তা-গবেষণা ও সাহিত্য সাধনা দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে হৃদয় ও চিন্তার জগতে এমনভাবে আশ্বস্ত করেছেন যে, ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দু যেমন দূর হলো তেমনি ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যও সুদৃঢ় হলো। উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা শিবলী নোমানী (রহ) এর আলফারূক, কুতুবখানা ইসকান্দারিয়া ও আল-জিযয়া ফিল ইসলাম ছিলো এ বিষয়ে সফল সাহিত্যকর্ম।

পাঠ্যব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন

স্বয়ং আপনাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও নিছাবে তালীমও সাক্ষ্য দেয় যে, ওলামায়ে ইসলাম সময়ের বৈধ প্রয়োজন মেনে নিতে এবং কল্যাণপ্রসূ কোন পথ ও পন্থা গ্রহণ করতে কখনো দ্বিধা-সংকোচ করেননি। আমাদের আজকের এই নিছাবে তালীম যুগে যুগে বিভিন্ন পরিবর্তনের এবং বিভিন্ন ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রত্যেক যুগে তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়ে এসেছে। শুধু এই শেষ একশ বছর হলো এমন একটা সময় যখন নিছাব কাঠামোতে কম থেকে কম পরিবর্তন এসেছে। অথচ রাজনৈতিক ও চিন্তানৈতিক বিভিন্ন মৌলিক পরিবর্তনের কারণে এ সময়কালই ছিলো প্রয়োজনীয় সংস্কারের বেশী হকদার।

দ্বীনের প্রতিনিধিত্বের জন্য বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন

প্রিয় বন্ধুগণ! বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের এ যুগে দ্বীন ও শরীয়তের সার্থক প্রতিনিধিত্ব এবং ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাখ্যা উপস্থাপন এবং সময় ও সমাজের সামনে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে, আপনারা হলেন ইসলামের সিপাহী। এখানে আপনারা আগামী দিনের জীবন যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। কোন ফৌজি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য সব চেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে আধুনিক ও প্রাচীন অস্ত্র কিংবা একেলে ও সেকেলে সমর কৌশল সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা। যোদ্ধা

ও সিপাহীর কাছে কোন অস্ত্রই নতুন বা পুরাতন নয়। সে শুধু জানতে চায় , এখন রণাঙ্গনে কোন অস্ত্র এবং কোন্ সমর কৌশল অধিক কার্যকর?
কোন বিশেষ অস্ত্র বা সমর কৌশলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অবকাশ তার নেই। তাকে তো প্রয়োজনীয় সব অস্ত্রই হাতে নিতে হবে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপযোগী সব রণকৌশলই গ্রহণ করতে হবে। আরব কবি অনেক আগেই বলে গেছেন-

كل امرئ إلى/ يوم الهياج بما استعدا
'যোদ্ধা তো যুদ্ধ-দিনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়।
****

প্রিয় বন্ধুগণ! তালেবানে ইলম এবং ওয়ারিছে নবী হিসাবে যামানার নতুন নতুন ফেতনা সম্পর্কে আপনাদের অবশ্যই অবগত থাকতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে , অজ্ঞতার চেয়ে অপরিপক্কতা অনেক বেশী ক্ষতিকর। বর্তমানে আমাদের মাদরাসাগুলোতে নিছক ফ্যাশন হিসাবে কিছু কিছু আন্দোলন ও বাদ-মতবাদের আলোচনা হয় , কিন্তু সে সম্পর্কে তথ্য-অবগতি খুবই সামান্য , সুগভীর অধ্যয়ন ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা তো অনেক পরের কথা। কোন বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে এমনকি মৌলিক জ্ঞানও আমাদের নেই। অথচ সময়ের দাবী হলো শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় প্রচলিত চিন্তাধারা ও বাদ-মতবাদ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলোর মোকাবেলায় ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। সন্দেহ নেই যে , এ কাজ অতি কঠিন , তবে অতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে আমাদেরকে এ পথে অগ্রসর হতে হবে। সময়ের দাবীকে তো অস্বীকার করা যাবে না, যায় না। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে না হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অপরিকল্পিত ভাবেই তাহতে থাকবে , যা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী বয়ে আনবে।

আধুনিক অধ্যয়নের সমস্যা ও নাযুকতা

সম্প্রতি আমাদের মাদরাসা-মহলে আধুনিক গবেষণা ও অধ্যয়নের চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে , কিন্তু আফসোসের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে যে , তাতে গভীরতা ও চিন্তামনস্কতার ছাপ নেই এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নির্দেশনা নেই। আমি আধুনিক চিন্তা-গবেষণা ও অধ্যয়নের উদার প্রবক্তা। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে , এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে সঠিক নির্বাচন, পর্যায়ক্রম নির্ধারণ এবং যোগ্য মুরুব্বী ও প্রথপ্রদর্শকের সার্বক্ষণিক সঙ্গ অপরিহার্য। তারও আগে জরুরী হলো চিন্তা-চেতনা এবং বোধ ও বুদ্ধির এই পরিমাণ পরিপক্কতা অর্জন করা যাতে গবেষণা ও অধ্যয়ন থেকে পূর্ণ ফায়দা গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সঠিক বিন্যাস ও নির্ভুল ব্যবহার সম্ভব হয়। আসাভাযা কেরামের সঠিক শিক্ষা ও নিবিড় সান্নিধ্য দ্বারা চিন্তা-চেতনা এবং বোধ ও বুদ্ধি পরিপক্ক হলেই শুধু অধ্যয়নকৃত বিষয় থেকে সঠিক কাজ নেয়া এবং তথ্য-উপাত্তের কাঁচামাল থেকে কার্যকর সামগ্রী উৎপন্ন করা এবং ইতিহাস, সাহিত্য ও সাধারণ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে। এমনকি ধর্ম-সম্পর্কহীন বিষয়ও দ্বীনী ও দাওয়াতী ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যা নির্ভেজাল দ্বীনী বিষয়েও কল্পনা করা যায় না। তখন কোরআনের ভাষায়-

من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين

(গোবর ও রক্তের মধ্য হতে পানকারীদের জন্য সুপেয় খাঁটি দুধ বের করে আনা)এর বাস্তব প্রকাশ ঘটবে।

পক্ষান্তরে গভীরতা ও পরিপক্কতার বিষয়টি যদি বিবেচনায় রাখা না হয় , চিন্তা-চেতনায় ও মন-মস্তিষ্কে দ্বীন ও ঈমানের বুনিয়াদ যদি সুদৃঢ় না হয় বরং চিন্তা যদি হয় বক্র এবং রুচি যদি হয় অসুস্থ তাহলে কবির ভাষায়-

هر چه گیرد و علتی علت شود

'যা কিছু গ্রহণ করবে রোগ নিরাময়ের জন্য তাই হবে নতুন রোগের কারণ'।

দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক

এখানে আমি দু'টি বাস্তব সত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম কথা এই যে , কোন দেশে, কোন সমাজে দ্বীনের খেদমত ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং গণজীবনে পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য সে দেশের ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ পারদর্শী ও পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী হওয়া এবং জীবন্ত ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করা অপরিহার্য। মুখের ভাষা যদি হয় মর্মস্পর্শী এবং কলমের গতি যদি হয় সাবলীল তখন দ্বীনের দাওয়াত হয় অধিকতর কার্যকর ও ক্রিয়াশীল। এটা এমনই এক মনস্তাত্ত্বিক সত্য ও সাচ্চা হাকীকত যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলকেও সর্বোত্তম ভাষা দান করা হয়েছে, যাতে স্বজাতিকে তিনি পূর্ণ আস্থার সাথে সম্বোধন করতে পারেন এবং তাঁর বক্তব্য যেন জাতির মন-মস্তিষ্কে ও হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই কোরআনুল কারীমে বলা হয়েছে

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

'এই কিতাবকে আমি আরবী ভাষার কোরআন রূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

কোথাও বা বলা হয়েছে এখনও **'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছি'**।আবার ইরশাদ হয়েছে

و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
'কোন রাসূলকে আমি তার কাওমের ভাষা ছাড়া প্রেরণ করিনি'।

বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ জানেন 'লিসানুল কাওম' বা 'কাওমের ভাষা দ্বারা শুধু এতটুকু উদ্দেশ্য নয় যে , তিনি তাদের কথা বোঝেন এবং তারাও তাঁর কথা বোঝে , বরং উদ্দেশ্য এই যে , তিনি তাঁর যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ মানে উত্তীর্ণ হবেন, বরং সবাইকে ছাড়িয়ে যাবেন। এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় এখান থেকে যে , আলোচ্য আয়াতে এর পরই বলা হয়েছে ليبن لهم -যেন তিনি তাদের জন্য বয়ান করতে পারেন। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- أنا أفصح العرب 'আমি আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী।
আপনারা জানেন, ইসলামী উম্মাহর তাজদীদ ও সংস্কারের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যারা অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কর্ম এবং বড় বড় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং মুসলিম সমাজের মন-মানস ও চিন্তা-চেতনায় গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন সাধারণত তাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের এবং মুখ ও কলমের প্রবল শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের কথায় ও লেখায় ছিলো উন্নত সাহিত্য-রুচি ও অলংকার সৌন্দর্যের অপূর্ব প্রকাশ।

হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) এর মাওয়ায়েয ও নীতি-বক্তৃতাগুলো আজও জাদু-বাগ্মিতা ও আবেদনময়তার জীবন্ত নমুনা রূপে স্বীকৃত। তদ্রূপ মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহঃ) এর মাকতুবাত সাহিত্যের গতি ও শক্তি এবং সাবলীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার বিচারে সে যুগের 'রাজসাহিত্যিক' আবুল ফযল ও ফায়যীর কলম-কুশলতা ও সাহিত্যমান থেকে বহু উচ্চস্তরে সমাসীন। তদ্রূপ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) এর অমর গ্রন্থ

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' হচ্ছে আরবী সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষার এমন অনন্য সুন্দর নিদর্শন যে , মুকাদ্দামা ইবনে খালদুনের পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তার চেয়ে উত্তম কিছু আমাদের নযরে পড়ে না। শাহ ছাহেবের ফারসী রচনায়ও যথেষ্ট সৌন্দর্য ও সাবলীলতা রয়েছে। ইযালাতুল খিফা কিতাবের কোন কোন অংশ তো ফারসী সাহিত্যের উজ্জ্বল নমুনা রূপে পেশ করা হয়।

এটা তখনকার কথা যখন আরবী ও ফারসী ছিলো উপমহাদেশে মুসলিম-বুদ্ধিবৃত্তির স্বীকৃত ভাষা। পরবর্তীতে যখন উর্দু ভাষার প্রচলন হলো এবং তা সাধারণ মানুষের প্রধান ভাষার মর্যাদা লাভ করলো তখন খোদ দেহলবী পরিবারের সন্তানগণই উর্দুকে "কলমের ভাষা' রূপে গ্রহণ করলেন। শাহ আব্দুল কাদের (রহঃ)-এর কোরআন তরজমা দিল্লীর টাকশালী উর্দুর সুন্দরতম নমুনা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং প্রামাণ্যতা, সাহিত্যগুণ ও অলংকার সৌন্দর্যের কারণে উর্দু ভাষার ক্লাসিক সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তদ্রূপ মাওলানা নানুতবী (রহঃ)-এর উর্দু রচনা এমন সরল , সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত যে , জটিলতম ও সূক্ষ্মতম ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা সাধারণ পাঠকের রুচিবোধেও গুরুভার মনে হয় না।

পাক-ভারত উপমহাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব সুদীর্ঘকাল আলেম সমাজের হাতেই ছিলো এবং তাঁরাই এদেশের সাহিত্য-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন। খাজা আলতাফ হোসায়ন হালী , মৌলবী নযীর আহমদ দেহলবী এবং মাওলানা শিবলী নোমানীকে অতি সঙ্গত কারণেই উর্দু ভাষার নির্মাতাদের কাতারে শামিল করা উচিত। উর্দু ভাষার উলামায়ে কেরাম তাদের সূক্ষ্মরুচি , স্বভাব-বিশুদ্ধতা, রসবোধ ও রচনাকুশলতার এমন অনন্য সাধারণ নমুনা রেখে গেছেন যা উর্দু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য হয়। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানীর রচনাসমগ্র এবং নাযিমে নাদওয়াতুল উলামা মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হাই (রহঃ) বিরচিত 'তাযকিরায়ে গুলে রা'না' এবং ইয়াদে আইয়াম' হচ্ছে উর্দু গদ্যসাহিত্যের এমন অপূর্ব নমুনা যাতে ইতিহাসের গম্ভীরতা, সাহিত্যের কুশলতা ও অলংকারের বর্ণিলতার ঈর্ষণীয় সমাবেশ ঘটেছে। সর্বোপরি প্রাতন্মরণীয় মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদবী (রহঃ) তো উর্দুসাহিত্যকে জ্ঞানগবেষণা ও সাহিত্য রচনা দ্বারা চিরঋণী করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলী এখন যেমন, তেমনি আগামী বহুদিন ভাষা ও সাহিত্যের এবং চিন্তা ও গবেষণার মানদণ্ড বলে গণ্য হবে। তদ্রূপ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রচনাবলীও উর্দু-ভাষাকে নতুন শক্তি ও গতি এবং নতুন ভঙ্গি ও শৈলী দান করেছে। তার সম্পাদিত আল-হেলাল-এর 'সিহরে হালাল' ও ভাষা-যাদু তো সমগ্র ভারতবর্ষকে বিমুগ্ধ করে রেখেছিলো। এমনকি সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে এখনো তার নিজস্ব অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে।

আলেম সমাজের এই জাগ্রত চেতনা এবং সময় ও সমাজমনস্কতার সুফল এই ছিলো যে , তাঁদের বিরুদ্ধে কখনো জাতিনির্মাণের মহান কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতার এবং সমাজের গতি ও প্রবণতা সম্পর্কে অজ্ঞতার অভিযোগ উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আলেমগণ স্বদেশে কখনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে থাকার চেষ্টা করেননি এবং কোন কোন দেশের আলিমদের মত যামানার কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েননি। দ্বীনের দাওয়াত , উম্মাহর খিদমত এবং সমাজকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সে ভাষাই তাঁরা ব্যবহার করেছেন যা তখনকার সমাজে সুপ্রচলিত ছিলো এবং সাহিত্যিক মহলে যার কদর ও সমাদর ছিলো।

ওলামায়ে কেরামের এ ঐতিহ্য আমাদেরও ধরে রাখতে হবে এবং এ মহান উত্তরাধিকার যে কোন মূল্যে সংরক্ষণ করতে হবে। আজকের যুগেও যদি আমরা দ্বীনের যথার্থ খিদমত আঞ্জাম দিতে চাই এবং বিশিষ্ট-সাধারণ সর্বমহলে আমাদের চিন্তা-বিশ্বাস ও বক্তব্য পৌঁছাতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই যুগের ভাষায় কথা বলতে হবে এবং যুগের ভাষায় লিখতে হবে। এটা ভাবগাম্ভীর্যের বিপরীত যেমন নয় তেমনি পূর্বসূরীদের রীতি-নীতিরও পরিপন্থী নয় , বরং এটাই দ্বীনী প্রজ্ঞার দাবী।

আরবী ভাষার গুরুত্ব

দ্বিতীয় বিষয় এই যে , সব সময়ের মত এখনো আরবী ভাষা জীবন্ত ও গতিশীল ভাষা। আরব বিশ্বে আরবী ভাষা এখন তার পূর্ণ জোয়ার ও যৌবনকাল অতিক্রম করছে এবং চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। বিশ্ব সভায় আরবী ভাষা এখন আইন ও সংবিধান, জ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও সংবাদপত্র এবং রচনা ও গবেষণার ভাষা রূপে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন।

আমাদের মাদরাসা-মহলে এ ভুল ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছে যে , প্রাচীন আরবী ভাষা এখন হাদীছ , তাফসীর ও ফেকাহর পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ , এর বাইরে তার বিচরণ নেই। পক্ষান্তরে আধুনিক আরবী নামে নতুন এক ভাষা আত্মপ্রকাশ করেছে যার সাথে দ্বীন ও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এই মারাত্মক ভুল ধারণার শিকার হয়ে আলিম ও তালিবে ইলম সমাজ আরবী ভাষা চর্চার প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার উপর যদি আপনারা আস্থা রাখতে পারেন তাহলে আমি পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলতে চাই যে , তথাকথিত আধুনিক আরবীর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। আরব বিশ্বে লেখক সাহিত্যিকদের কলমে এবং জ্ঞানী-গুণীদের মজলিসে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা কোরআন হাদীছ এবং জাহেলিয়াত ও ইসলামী যুগের ভাষার নিকট থেকে নিকটত্তর ভাষা। এমনকি আধুনিক যুগের দাবী ও প্রয়োজন পূরণের জন্যও তারা আরবী ভাষার প্রাচীন ভাণ্ডার ও কোরআন-হাদীছ থেকেই শব্দ সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ে তারা যে অনন্য সাধারণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি প্রশংসাযোগ্য। মিসরে নেপোলিয়নের হামলার পর আরবী ভাষার উপর পশ্চিমা ভাষার যে প্রবল আগ্রাসন শুরু হয়েছিলো আলেম সমাজ শুধু যে তার সফল মোকাবেলা করেছেন তাই নয় , বরং অনুপ্রবেশকারী সমস্ত শব্দকে তারা ঝেটিয়ে বিদায় করেছেন এবং সেগুলোর স্থানে খাঁটি আরবী শব্দের ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন।

আরব বিশ্বে ভাষা ও সাহিত্যের মান এখন এত উন্নত এবং সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিপ্লবের সুবাদে ভাষার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এত সার্বজনীন যে , আরবীতে কলম ধরার জন্য এখন বিরাট প্রস্তুতি ও চর্চা সাধনার প্রয়োজন। আমাদের মাদরাসা-মহলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার যে অবস্থা তাতে আরব দেশে আরবদের মাঝে দ্বীনী ও দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করা এক কথায় অসম্ভব। সুতরাং যদি আরব জাহানে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হয় এবং ভারতবর্ষের ইলমী খিদমত ও দাওয়াতী মিহনত আরবদের সামনে তুলে ধরতে হয় , সর্বোপরি যদি আরব বিশ্বের সাথে আমাদের দ্বীনী রাবেতা ও ধর্মীয় বন্ধন জোরদার করতে হয় তাহলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক জ্ঞান ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আর সে জন্য ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন।

বিশেষত বর্তমান যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং এখানকার উলামা সমাজ আরব জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। কেননা বিশ্ব রাজনীতিতে আরব জাহান ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকা এখন বেশ জোরদার এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাছাড়া পিছনে যেমন , তেমনি এখন এবং তেমনি ভবিষ্যতেও আরব বিশ্বই হবে ইসলামী জাহানের প্রাণ-কেন্দ্র এবং আরব জাতিই হবে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যাশিত নবজাগরণের উৎস। সুতরাং পাক-ভারত উপমহাদেশের আলেম সমাজ যদি আরব জাহানের সঙ্গে দ্বীনী ইলমী ও কলবী সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টায় ব্রতী না হয় তবে তা তাদের ভবিষ্যতের জন্য যেমন শুভ হবে না , তেমনি এদেশ ও আরব দেশ কারো জন্য কল্যাণকর হবে না। অতএব এদিকেও আমাদের বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। ভাষা ও সাহিত্য হলো জীবন্ত ও গতিশীল বিষয়। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু সময়ের জন্যও যদি তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং চলমান কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে তাহলে দীর্ঘদিন তার ক্ষতি ও মাশুল আদায় করতে হয়।

ছহীহ আকীদার হেফাযত

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদের প্রচুর সময় নিয়েছি। কিন্তু 'বহুদিন পরে পেয়েছি বন্ধুর দেখা , আর খুলে গেছে মনের দুয়ার' তাই কথা দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক। এখন বিদায়ের আগে শেষ কথা বলতে চাই , যা শেষে বলা হলেও গুরুত্বে কোন অংশেই কম নয়। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের সবচেয়ে গৌরবময় কীর্তি ও অবদান এই যে , সর্বশক্তি দিয়ে তারা মুসলিম উম্মাহর দ্বীনী জায়বা ও পায়রাত এবং জাতীয় চেতনা ও স্বকীয়তার পূর্ণ হেফাযত ও সংরক্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে কখনো তাঁরা সময়ের কোন ফেতনার সামনে আত্মসমর্পণ করেননি। সমাজের কোন বিদ'আত ও রসম-রেওয়াজের সাথে আপোশ করেননি এবং জাহেলিয়াতের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা কোন চিন্তাধারার প্রতি বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। আপনাদের মহান পূর্বসূরীদের মাঝে বিগত হয়েছেন হয়রত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ)-এর মত 'পর্বত-অটল' ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, যারা ছিলেন দ্বীন ও শরীয়তের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁরা জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছেন , সবকিছু বরদাশত করেছেন, কিন্তু সমাজের শরীয়ত বিরোধী কোন আচরণ ও উচ্চারণ বরদাশত করেননি , বিদ'আত ও জাহেলিয়াত যে নামে এবং যে রূপেই মাথা তুলেছে তার সাথে কোন আপোশ করেননি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের পর এ দেশে যখন পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং লা-দ্বীনী মতবাদ ও চিন্তাধারার তুফান সায়লাব শুরু হলো তখন তাঁরা পাহাড়ের মত নিজেদের অবস্থানে অটল ছিলেন এবং তার সামনে 'সদ্দে সিকান্দারি'র মত প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। শরীয়তের 'ছোট-বড়' প্রতিটি বিষয়ে তাঁরা এতই দূরদর্শী ও সংবেদনশীল ছিলেন যে, মুসলিম সমাজে শিকড় গেড়ে বসা কোন বিদ'আতী আচার আচরণ ও চিন্তা-বিশ্বাসকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বৈধতার সনদ প্রদান করেননি, বরং দ্বীন ও শরীয়তের সদাজাগ্রত প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়কের কঠিন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। কোন বিদ'আত ও বিচ্যুতি তাঁদের সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

সমাজের নিন্দা-সমালোচনা, আ গালি-গঞ্জনা এবং ধর্মব্যবসঙ্গীয়দের 'কাফের ফতোয়া' সবকিছু তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেছেন, কিন্তু নীতি ও অবস্থান ত্যাগ করেননি। ফলে সচেতন ও চিন্তাশীল শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ যাবতীয় বিদ'আত থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রয়েছে এবং সাধারণ মুসলমানদের জীবনে এখনো কোন বিদ 'আত স্বীকৃতি ও বৈধতা লাভ করতে পারে নি। দ্বীন ও শরীয়তের হেফাযাতকারী এই মর্দে মুমিনদের কবরকে আল্লাহ সুশীতল ও শান্তিময় করুন এবং উম্মতের পক্ষ হতে সর্বোত্তম জাযা দান করুন। তাঁদেরই জন্য তো কবি জানিয়েছেন এই মিনতি-

آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگھبانی کرے

'আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির বর্ষণ করে। আর সবুজ গালিচা যেন এ ধরকে সযত্নে ছায়া দান করে। তাঁদের ঈমানী প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি এবং দ্বীনী সমঝ ও জ্ঞান-গভীরতার মূল্য এখন আমাদের বুঝে আসে যে , কত সুচারু রূপে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا

মুমিনদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেতাদের একদল তো (শাহাদাত বরণ করে) জীবনায়ু পূর্ণ করেছেআর এক দল (শাহাদাতের) অপেক্ষায় রেয়েছে। (পূর্ববর্তীদের শাহাদাতের কারণে) তারা (তাদের আচরণে) কোন পরিবর্তন আনেনি।

তাই আপনাদের খিদমতে আমার আকুল আবেদন, মহান পূর্বপুরুষদের গচ্ছিত মহামূল্যবান আমানত আপনারা রক্ষা করুন। 'প্রাণ-প্রাচীর' সৃষ্টি করে। এই 'দ্বীন-বাগিচা' তাঁরা রক্ষা করেছেন এবং খুন পসিনা দিয়ে তার সজীবতা ও বাহার অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং যিন্দেগী ও জোয়ানি কোরবান করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, দ্বীন-বাগিচার রক্ষা ও পরিচর্যা কীভাবে করতে হয়। কবির ভাষায়-

آغشته ایم هر سر خارے بخون دل قانون باغبانی صحرا نوشته ایم

'বুকের রক্ত সিঞ্চন করে বাগিচার প্রতিটি বৃক্ষ সজীব রেখেছি এবং মরুভূমির মরুদ্যান রক্ষার উপায় লিখে দিয়েছি।
আমাদের বিদায় বেলা বন্ধু এবার তোমাদের পালা।

সুতরাং এই পাক আমানতকে আমাদের সিনার সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে এবং এই 'দ্বীন-সম্পদকে' জীবন-সম্পদের চেয়ে মূল্যবান মনে করতে হবে। কিন্তু আপনাদের প্রতি আমার ব্যথিত হৃদয়ের অনুযোগ এই যে, দিন দিন আপনারা কিন্তু তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আপনাদের মহান পূর্বপুরুষদের শ্রেষ্ঠ মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা যে সম্পদের হেফাযাতে ব্যয় হয়েছে এবং যে কারণে সময় ও সমাজের কাছে তাঁরা এবং সম্পর্কের সুবাদে আপনারাও - অপ্রিয়পাত্র হয়েছেন সেই সম্পদ এখন আপনাদের হাতছাড়া হতে চলেছে। এমনকি বাস্তব অবস্থা তো এই যে, আপনাদের অনেকেই মহান পূর্ববর্তীদের কর্ম ও কীর্তি সম্পর্কেও অবগত নন। আপনাদের কয়জন আজ শাহ ইসমাঈল শহীদকে জানেন ও চেনেন? কিংবা তাঁর 'ছিরাতে মুসতাকীম' ও 'তাকবিয়াতুল ঈমান' পড়েছেন? আপনাদের কয়জন তাওহীদ ও সুন্নতের ছহী হাকীকত জানেন ও বোঝেন, কিংবা বলতে পারেন যে, জাহেলী যুগের লোকদের ঈমান বিল্লাহ-এর হাকীকত কী ছিলো এবং কী কারণে কোরআন তাদেরকে মুশরিক বলেছে? তাওহীদের স্তর কী কী? শিরকের প্রকাশক্ষেত্র কী কী? বিদ'আতের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কী? এবং বিদ'আতের ক্ষতি ও খাতরা কী কী? এ সকল বিষয়ে আপনাদের পূর্ণ ইলমী ও আমলী প্রস্তুতি দরকার। এ বিষয়ে আপনাদের জ্ঞান ও অর্ন্তজ্ঞান সাধারণের স্তর থেকে অনেক বেশী বিশিষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু আমার আশংকা এই যে, আপনাদের অনেকেই এ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থেকেও বঞ্চিত।

নতুন যুগের নতুন ফিতনা

একই সঙ্গে আরেকটি বাস্তব সত্য এই যে, নতুন যুগ এখন নতুন ফেতনা নিয়ে সামনে আসছে। জাহেলিয়াত নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। আগে ছিলো বিদ 'আতের মু'আমালা, কিন্তু এখন শুরু হয়েছে প্রকাশ্য মূর্তি পূজার মোকাবেলা। আগে ছিলো সর্বেশ্বরবাদের শ্লোগান, কিন্তু এখন শুরু হয়েছে একধর্মবাদের জিগির। শুরু হয়েছে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদসহ বিভিন্ন বাদ-মতবাদের নতুন নতুন ধর্ম। এগুলো এখন আমাদের ধর্মীয় চেতনা, আমাদের দ্বীনী গায়রত এবং আমাদের তাওহীদী আকীদাকে চ্যালেঞ্জ করছে। এখন দেখার বিষয় এই যে, এক সময় যারা সামান্য বিদ 'আত ও রসম-রেওয়াজকে ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলো না, তাদের উত্তরাধিকারীরা এই সব শিরক ও কুফুরীকে কীভাবে বরদাশত করে এবং এগুলোর মোকাবেলায় তাদের। নীতি ও অবস্থান কেমন হয়? আমরা তো আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের দ্বীনী হিম্মত ও সাহসিকতা, দ্বীনী গায়রত ও চেতনার কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দেই যে, বাতিলের সামনে তাঁরা মাথা নত করেন নি, এখন দেখার বিষয় এই যে, আমাদের সম্পর্কে আমাদের পরবর্তীরা কী সাক্ষ্য দেবে? এবং ইতিহাসের পাতায় আমরা কী স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছি?

***

প্রীয় বন্ধুগণ! আসমানী তাকদীরের ফায়সালা আমাদের জন্য যে যুগ ও সময় নির্বাচন করেছে তার দায়-দায়িত্ব বিগত সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। তবে আল্লাহর দরবারে তার প্রতিদান ও সম্মানও অনেক বেশী। ঝুঁকি ও ক্ষতির ভয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং সময়ের প্রতিকূলতার কাছে পরাজয় স্বীকার করা সাহসী পুরুষের কাজ নয়, কাপুরুষের কাজ। আপনাদেরকে অবশ্যই সাহসের পরিচয় দিতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে আগামী দিনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। আপনাদের হাতে এখনো যতটুকু সময় আছে সেটাকে প্রস্তুতির কাজে ব্যয় করুন। সময়ের গুরুতরতা এবং দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করুন এবং নিজেকে মূল্যবান ও ফলবান রূপে তৈয়ার করুন, যাতে আগামী দিনে কর্মের ময়দানে উম্মতের সৌভাগ্য নির্মাণে গৌরবময় আবদান রাখা সম্ভব হয়। কবির ভাষায়

وقت هز است و کارسازیست غافل منشیں، نہ وقت بازیست

গাফেল হয়ো না, সময় কারো জন্য বসে থাকে না।

[তথ্যসূত্রঃ জীবন পথের পাথেয় পৃষ্ঠা:- ৮১-১১৮]